জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪১তম সংখ্যা

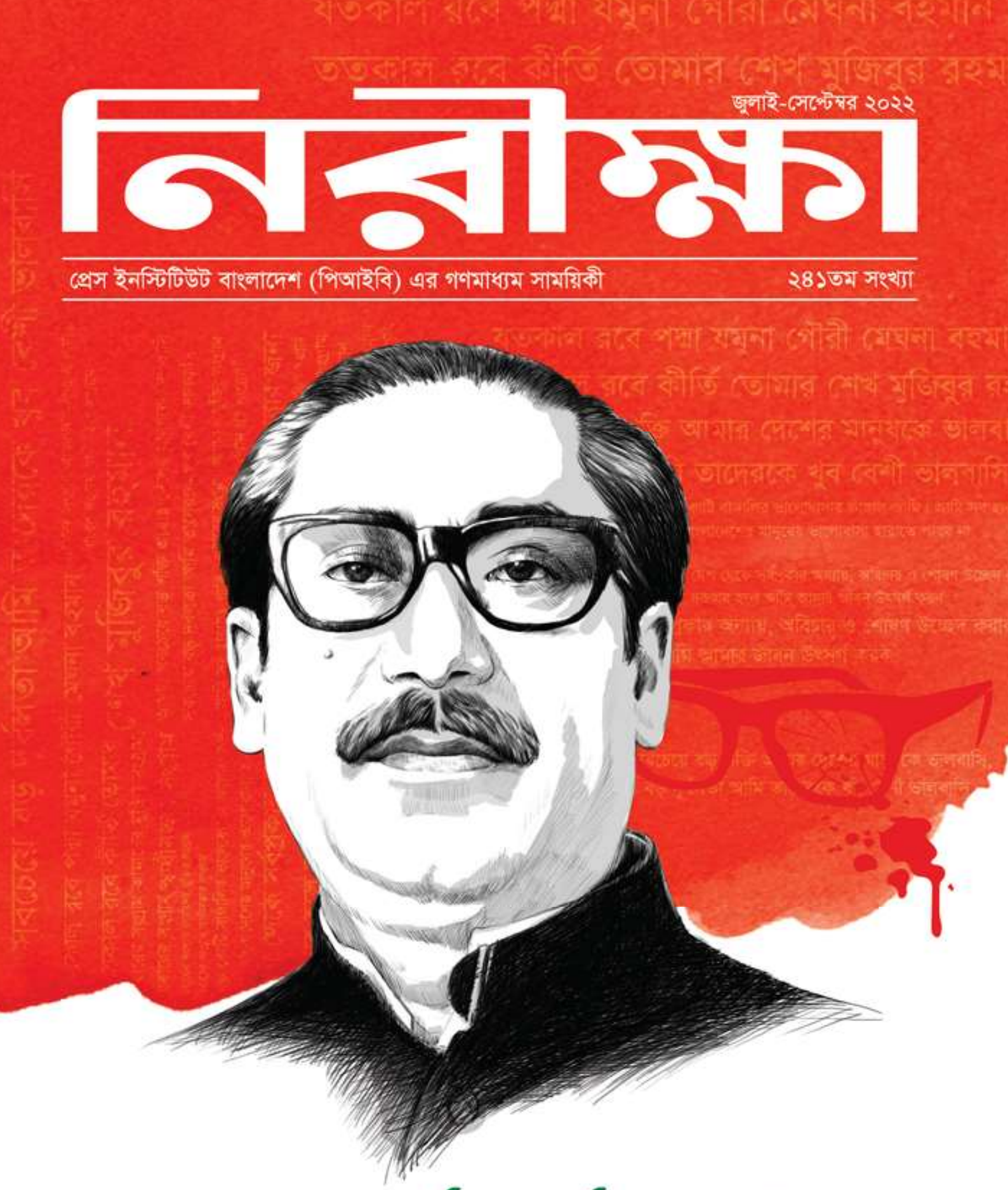

মহামানব

নিরীক্ষা

২৪১তম বিশেষ সংখ্যা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

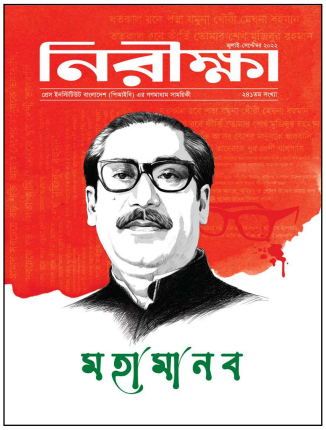

তিনি ছিলেন জনগণের প্রিয় নেতা। ছিলেন বাঙালি অন্তঃপ্রাণ। অন্যায়-অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সোচ্চার। তাই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকার তাঁকে দমাতে নানা ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথ বেছে নেয়। অন্যায় আর শোষণের কাছে কখনো নত হয়নি মস্তিষ্ক। ক্ষমতার লোভে তাঁকে কেউ বশ করতে পারেনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল পর্বতসমান অটল, দৃঢ় ও শক্তিশালী। সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি একজন সাহসী ও আদর্শবাদী নেতা। তাঁর পেছনে, সামনে এবং পাশে ছিল মানুষ আর মানুষ। এককথায়–বাংলার মানুষের হৃদয়ে ছিল তাঁর স্থান। মানুষের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি হয়েছেন মহামানব। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে বাঙালিকে মুক্ত করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন 'স্বাধীনতা' এনে দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে বাংলার সাহসী সন্তানরা দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'বিজয়' অর্জন করেছে। বাঙালি বীরের জাতি হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে নন্দিত হয়েছে। তিনি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধুর শোকের দিন। পঁচাত্তরের এই দিনে কতিপয় সেনা সদস্য ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। এ সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান। অবশ্য নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘাতকদের দৃশ্যমান বিচার হয়েছে। নিম্ন আদালত ও হাইকোর্ট পেরিয়ে আপিল বিভাগ হয়ে এই মামলার চূড়ান্ত রায়ও হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে কয়েকজনের শাস্তিও কার্যকর করা হয়েছে। তবে পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে দণ্ড কার্যকর করতে না পারাটা জাতির জন্য হতাশার। আমরা আশা করব, সরকার বিদেশে পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস জোরদার করবে। আজ প্রশ্ন উঠছে–এই হত্যাকাণ্ড কেবল কিছু চিহ্নিত খুনির কাজ নয়, এর নেপথ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কিছু তথ্য উঠে এসেছে দেশি-বিদেশি গবেষক-সাংবাদিকদের লেখায়। একই সঙ্গে এই ঘটনায় ছিল রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা। তাই দাবি উঠেছে একটি বিশ্বমানের কমিশন গঠন করে এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার। দেশবাসী আশা করে, সরকার এ লক্ষ্যে দ্রুত উদ্যোগ নেবে।

জাতির পিতার ৪৭তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে 'নিরীক্ষা'র এই বিশেষ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে। সংখ্যাটিতে প্রয়াত কয়েকজন সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনের প্রবন্ধ-স্মৃতিচারণ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর আবেদন সর্বকালীন। লেখকদের অনেকেই নানা সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়কে ধারণ করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই তাঁর স্নেহধন্য–একান্তজন ছিলেন। কালোত্তীর্ণ এসব লেখায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্মৃতি এবং সময়ের চিত্র উঠে এসেছে। আমরা সম্পাদকীয় নীতি মেনে প্রবন্ধগুলো হুবহু প্রকাশ করছি। এই ক্ষেত্রে ঘটনার সময় এবং পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়নি। প্রবন্ধগুলো পাঠক-চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস।

জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে আগস্টের প্রথম দিন থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়সহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) শোক দিবসকে সামনে রেখে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কালো ব্যাজ ধারণ, প্রতিষ্ঠানে শোক-শ্রদ্ধার ব্যানার টানানো, শোকসভা, দোয়া মাহফিলসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হোক আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

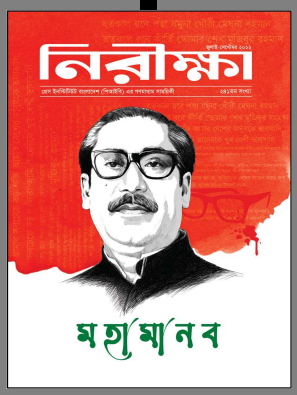

ইন্দ্রপাত ৫
অন্নদাশঙ্কর রায়

শেখ হাসিনা যেভাবে জানতে পেরেছিলেন ৮
হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী

পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর আগের এবং পরের কয়েকটি তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনা ১১
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বিপন্ন দিনগুলো ১৫
ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

পনেরো আগস্ট: ষড়যন্ত্রের পটভূমি বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং আমাদের করণীয় ২০
আবুল মাল আবদুল মুহিত

কালো দিঘল রাত এখনো পোহায়নি ২৪
অধ্যাপক সামছুল হুদা হারুন

কাছ থেকে দেখা: ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড ২৮
আ. ফ. ম. মহিতুল ইসলাম মুহিত

কাছ থেকে দেখা ৩১
লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ, পিএসসি

ছেলেবেলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার গল্পটা ৩৫
লুৎফর রহমান রিটন

৪২ চট্টগ্রামের প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চায় বঙ্গবন্ধু
কুমার প্রীতীশ বল

৪৭ ১৫ই আগস্ট: অপপ্রচার ও ইতিহাস হত্যার ষড়যন্ত্র
মাহামুদুল হক

৫২ ১৯৭১: বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার প্রক্রিয়ার সংবাদ
মো. মিনহাজ উদ্দীন

৫৯ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ভালোবাসার শক্তি পরিচয়
রেজা সেলিম

৬১ চাই আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন
অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

৬৪ বঙ্গবন্ধু হত্যা॥ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর ও বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া
রাজন ভট্টাচার্য

৬৮ তিনি এভাবেই এলেন এভাবেই চলে গেলেন
নিরঞ্জন রায়

৭১ বাঙালির তীর্থ
পপি দেবী থাপা

৭৩ বঙ্গবন্ধু হত্যা নিরূপণে তদন্ত
জাফর ওয়াজেদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতীয় শোক দিবস ২০২২

“এখন যদি কেউ বাংলাদেশের
স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে
সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে
মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে”

–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ইন্দ্রপাত

অন্নদাশঙ্কর রায়

বারো বছর আগে জার্মানি থেকে ফেরার পথে আমার বিমানসঙ্গী ছিলেন চট্টগ্রামের ইস্পাহানি সাহেব। সেকালের নামকরা বণিক ইস্পাহানির পুত্র। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমরা লুফট-হানসার বিমানে উঠি ও পাশাপাশি আসনে বসি।

'ব্যাবসাবাণিজ্যের দিক থেকে পার্টিশন একটা সর্বনাশা ব্যাপার। আমাদের কারবার ছিল প্রশস্ত পরিধিজুড়ে। তাকে টুকরো করতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভার পড়েছে আমার ওপরে। ওইটুকু গণ্ডির ভেতরে প্রসারণের পরিসর কোথায়?' তিনি আফসোস করেন।

অর্থনীতির প্রসঙ্গ থেকে আমরা রাজনীতির প্রসঙ্গে আসি। তিনি বলেন, 'আইয়ুব খান যে বেসিক ডেমোক্রেসি প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন তার ফল ভালো হবে না। মাত্র আশি হাজার জন ভোটার। টাকা ছড়িয়ে একচল্লিশ হাজার জন ভোটারকে হাত করা অতিসহজ। আইয়ুব চান চিরস্থায়ী হতে।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁর নিজের মতে কী করা উচিত। তিনি এর উত্তরে বলেন, 'রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলেই হয়। আগেকার মতো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে যারা জিতবেন তারাই সরকার চালাবেন।'

'কিন্তু সরকার চালানোর মতো যোগ্য লোক কি পূর্ব পাকিস্তানে কেউ আছেন?' আমার নিজের মনেই সংশয় ছিল।

'কেন? শেখ মুজিবুর রহমান।' তিনি নিঃসংশয়ে রায় দেন।

'শেখ মুজিবুর রহমান কি পারবেন একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে।' আমি তাঁর সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলুম।

'কেন পারবেন না? তাঁকে একটা সুযোগ দিলে ক্ষতি কী?' তিনি শেখ মুজিবকে চিনতেন ও তাঁর ওপর আস্থাবান ছিলেন।

ইস্পাহানি বাঙালি নন। মুজিব বাঙালি। কিন্তু লক্ষ করলুম তাঁর মধ্যে প্রাদেশিকতা নেই। এর কারণ বোধহয় তিনি ইরান দেশের আগন্তুক। পাকিস্তানি নাগরিক হলেও তার মানসিকতা

পূর্ব পাকিস্তানি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। কলকাতাতেই তিনি ভালো ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া তিনি পছন্দ করেননি।

'আপনার সঙ্গে কলকাতা অবধি গিয়ে সেখান থেকে অন্য ফ্লাইটে চট্টগ্রাম যাওয়াই আমার পক্ষে সুবিধের। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার সময়ের দাম আছে। কিন্তু ওরা কি সেটা বুঝবে? নিয়ম করে দিয়েছে করাচিতেই রাতের মাঝখানে নামতে হবে। করাচি থেকেই ফ্লাই করতে হবে ঢাকায়। সেখান থেকে চট্টগ্রামে। একটা দিন নষ্ট। আর রাতের ঘুমটাও।' তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তখন থেকেই আমার জানা যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের অদ্বিতীয় নেতা। পরে একদিন তাঁর আরও একপ্রকার পরিচয় পাই। আমার এক বন্ধুপুত্র ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে কাজ করতেন। কিছুকাল তাকে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনে নিযুক্ত থাকতে হয়। সেখান থেকে বদলি হয়ে এসে আমাকে তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব ভারতের কাছে অস্ত্র চেয়েছিলেন। আর মুক্তিসৈনিকদের ভারতের মাটিতে তালিম। পণ্ডিত নেহেরু সম্মত হন না।'

আমি তা শুনে তাজ্জব বনে যাই। মানুষ কী পরিমাণ মরিয়া হলে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করে! আইয়ুব খান মুজিবকে মুখ্যমন্ত্রী হতে না দিয়ে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছেন? তখ্‌তে বসিয়েছেন তিনি মোনায়েম খানকে। ময়মনসিংহে থাকতে একদিন ওকে আমার আদালতে বসে থাকতে দেখেছিলুম। মিনিস্টার চেহারা। দারুণ কমিউনাল বলে ওর দুর্নাম। হয়তো সেইটেই ওর যোগ্যতার মাপকাঠি।

আইয়ুব খানের পতনের পর শেখ মুজিবের সুদিন আসে। বেসিক ডেমোক্রেসি পরিত্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পুনঃপ্রবর্তিত হয়। সাবালকদের সবাইকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে মুজিবের দলের জয়জয়কার। শতকরা নিরানব্বইটা আসন কোন দল কবে কোন দেশের ইতিহাসে পেয়েছে? মুজিবের তো সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা।

সেই সময়ে কতকগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি হয় ঢাকায়। একটি ছাত্রের বাড়ি ঢাকায়। সে পড়ে শান্তিনিকেতনে। তাকে পাঠাই বই কিনে আনতে। সে বই নিয়ে আসে। উপরন্তু আনে কয়েকটি রেকর্ড। আমাকে বাজিয়ে শোনায়, কিন্তু হাতছাড়া করে না। রেকর্ড শুনে আমি চমকে উঠি। পাকিস্তান সরকার বের করতে দিচ্ছে অমন সব রেকর্ড। তাতে শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠ। কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা। সে কী উন্মাদনাভরা গান! গেয়েছে তরুণ-তরুণীরা। আবার যেন সেই ১৯০৫ সালের স্বদেশি আমল ফিরে এসেছে। লোকে পাকিস্তানের জন্য নয়, বাংলাদেশের জন্য পাগল। যে বাংলাদেশ তাদের একান্ত আপনার।

আজ বাদে কাল রাম রাজা হবেন; কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। তেমনই শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। তার বদলে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের এক দুর্গম স্থানে হলেন রাজবন্দি। যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আমার সেই রেকর্ড শোনার বারো মাসের পরেই রেডিয়োতে তাঁর সংবর্ধনার বিবরণ শোনা। তাঁর ভাষণ শোনা। রামের মতো তিনি ফিরে এলেন পুষ্পক বিমানে।

তিনি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন এতেই আমরা কৃতার্থ। কারণ, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। ঢাকায় পাকিস্তানি ফৌজ আত্মসমর্পণ না করলে, রাতারাতি ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ না করলে, পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে মুক্তি দিয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে না দিলে লন্ডন থেকে তিনি দিল্লি ও দিল্লি থেকে ঢাকায় পৌঁছাতেন না। তাঁর দিল্লির সংবর্ধনার বিবরণও শুনেছি। সেখানেও তিনি বাংলায় ভাষণ দেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণে ঢাকা যেতে পারিনি। পরে ডিসেম্বরে আসে অন্য এক আমন্ত্রণ। ততদিনে শেখ সাহেব স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছেন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবকে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি পদ। ইতোমধ্যে কলকাতায় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি আমার 'পথে প্রবাসে'র থেকে আবৃত্তি করে আমাকে অবাক করে দেন। পরে ঢাকায় বঙ্গভবনে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। তখন জানতে পাই তিনি ছাত্র বয়সে তাঁর পত্রিকার জন্য আমাকে চিঠি লিখে লেখা চেয়েছিলেন।

তার পরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যাওয়া হয় না। কিন্তু পরবর্তী একুশে ফেব্রুয়ারিতে সদলবলে নিমন্ত্রণ। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা হয়ে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিই। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর দক্ষিণপাশে শিক্ষামন্ত্রী, তাঁর পাশেই আমি। খুব কাছাকাছি পাই শেখ সাহেবকে। আমার অন্যতম হিরো। কিন্তু কথা বলার অবকাশ পাই নে। পেতুমও না, যদি না সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাদের প্রত্যাবর্তনের দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতেন।

সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা আমি ফিরে এসে লিখি ও এর নাম রাখি 'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে'। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ তাতে ছিল না। তিনি নিজেই আমাদের বারণ করেছিলেন। আজ তিনি নেই। আমারও তো বয়স হলো একাত্তর। আর কতদিন আছি কে জানে! কেউ না কেউ লিখে না রাখলে ভাবীকাল জানতেই পাবে না, শেখ মুজিব কী করেছিলেন ও কেন করেছিলেন। তাঁর নিষেধ তাঁর জীবৎকালে মান্য করেছি। এখন তিনি সব আপদ-বিপদের উর্ধ্বে। মরণোত্তর মানহানিরও শঙ্কা নেই। তিনি অমর।

এ বিবরণ আনুপূর্বিক নয়। পরেরটা আগে, আগেরটা পরে, যখন যেটা মনে আসছে তখন সেটা কলমের মুখে আসছে। ভাষা ও ভঙ্গি শেখ সাহেবের নয়, তবে বক্তব্যটা তাঁরই। ভুলচুক যদি ঘটে থাকে তবে সেটা আমার স্মৃতির ভ্রম।

'দেখুন আমি দুই-দুইবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রথমবার আইয়ুব খানের বন্দিশালায়। ষড়যন্ত্রের মামলায়। আমার এক সাথী আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, সন্ধ্যাবেলা সেলের বাইরে গিয়ে নিয়মিত বেড়ানোর অভ্যাসটি বিপজ্জনক। পেছন থেকে গুলি করবে আর বলবে পালিয়ে যাচ্ছিল বলে গুলি করেছি। অন্যের বেলা ঘটেওছিল ওরকম গুলি চালনা। দ্বিতীয়বার ইয়াহিয়া খানের কারাগারে। আমার সামনেই আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। মনটাকে তৈরি করে নিই যে মরতে যখন হবেই তখন মিছে ভয় কেন? শান্ত মনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি।' শেখ সাহেব বলে যান।

সেদিন তিনি বেশ খোশমেজাজে ছিলেন। সাতজন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁকে বুঝিয়েসুঝিয়ে লাহোরে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে নিয়ে যেতে। তিনি তাঁদের সাফ বলে দিয়েছেন যে আগে স্বীকৃতি, তার পরে সম্মেলনে যোগদান। এখন কী হয় দেখা যাক। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘণ্টাকয়েক যেতে না যেতেই পাকিস্তান দেয় স্বীকৃতি আর রাত পোহাতে না পোহাতেই শেখ উড়ে যান লাহোরে। সেখানে পড়ে যায় সংবর্ধনার ধুম। শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, 'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো?'

'শুনবেন?' তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারত। তারা জগৎ জয় করতে পারত। 'They could conquer the world.'

বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বলেন, 'দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ

বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাঁদের প্রস্তাবে। তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে শুরু করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা। হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল! বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ করত। হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে পাক বাংলা। কেউ বলে, পূর্ব বাংলা। আমি বলি–না, বাংলাদেশ। তারপর আমি স্লোগান দিই, জয় বাংলা। তখন ওরা বিদ্রুপ করে বলে, জয় বাংলা না জয় মা কালী। কী অপমান! সে অপমান আমি সেদিন হজম করেছি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয় বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয়; যা সাম্প্রদায়িকভাবে ঊর্ধ্বে।'

'জয় বাংলা' আসলে একটি মন্ত্র। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বা দাদাভাই নওরোজীর 'স্বরাজ' বা গান্ধীজির 'কুইট ইন্ডিয়া'

> আমার সামনেই আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। মনটাকে তৈরি করে নিই যে মরতে যখন হবেই তখন মিছে ভয় কেন? শান্ত মনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি

বা নেতাজী সুভাষের 'চলো দিল্লি'। এ হলো শব্দব্রহ্ম। একটি শব্দের বা শব্দের সমষ্টির মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত। সে-শক্তি অসাধ্য-সাধনপটীয়সী।

একটি কমিউনাল পার্টিকে ন্যাশনাল পার্টিতে রূপান্তরিত করা চারটিখানি কথা নয়। বারবার জেলে গিয়ে বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি একদিন সত্যি-সত্যিই পেয়ে যান তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ অবিভক্ত না হলেও সার্বভৌম ও স্বাধীন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দিনই পেলেন পাকিস্তানের স্বীকৃতি। পরে ইউনাইটেড নেশন্সে আসন। একজন ব্যক্তি তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সে এর চেয়ে বেশি সার্থকতা প্রত্যাশা করতে পারেন কি? আর কেউ কি পারতেন?

সেদিন আমাদের বিশ্বাস করে আরও একটি কথা বলেন শেখ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়ে নেন যে আমরা প্রকাশ করব না। আমি এখন কথার খেলাপ করছি ইতিহাসের অনুরোধে। আমি প্রকাশ না করলে কেউ কোনোদিন করবে না।

'আমার কী প্ল্যান ছিল, জানেন? অকস্মাৎ আমরা একদিন পাওয়ার সিজ করব। ঢাকা শহরের সবকটা ঘাঁটি দখল করে নেব। আর্মিতে, নেভিতে, এয়ারফোর্সে, পুলিশে, সিভিল সার্ভিসে আমাদের লোক ছিল। কিন্তু একটা লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সব পণ্ড হয়। নেভির একজন অফিসার বিশ্বাস করে তাঁর অধীনস্থ একজনকে জানিয়েছিলেন। সে ফাঁস করে দেয়। তখন আমরা সবাই ধরা পড়ে যাই।'

আমি প্রশ্ন করি, 'ঘটনাটা ঘটত কোন তারিখে?'

তিনি মৃদু হেসে উত্তর দেন, 'বলব না।'

আমি চুপ। বুঝতে পারি অশিষ্টতার মাত্রা অতিক্রম করেছি।

বহু তপস্যার ফলে মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের ইন্দ্র হয়। পুণ্যবল ক্ষয় হলে বা অসুররা প্রবল হলে পরে একদিন সেই ইন্দ্রের পতনও হয়। দুই-দুইবার মরণের মুখ থেকে বেঁচে এসে তিনবারের পর তাঁকে মৃত্যুর কবলে পড়তে হলো। পাওয়ার সিজ করল তাঁরই স্বদেশবাসী ও স্বজাতি। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।

এর কি কোনো দরকার ছিল? সাক্ষাৎকারের দিনই তো শেখ সাহেব আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি আর ক্ষমতার আসনে থাকতে চান না, কী করবেন, তাঁর দলের লোক যে তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, তাঁর কাজ সারা হয়েছে।

তিনি যা যা চেয়েছিলেন সবকিছুই পেয়েছেন।

ঠিক সময়ে সরে গেলে দলের মধ্যে ভাঙন ধরত। সে ভাঙন শুধু স্বার্থঘটিত কারণে নয়, মতবাদঘটিত ও পলিসিঘটিত কারণেও। সব বাঙালি কখনো এক হতে পারে না, সব বাংলাদেশি কখনো এক হতে পারে না, সব মুসলমানও কি কখনো এক হতে পারে? সব মুসলমানের জন্য পাকিস্তান একটি অনাসৃষ্টি। তার এক অংশের থেকে অপরাংশ হাজার মাইল দূরে। মাঝখানে সমুদ্র নয়, অপর এক দেশ। তার কোনো স্বাভাবিক কেন্দ্রস্থল ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনোকালেই মেজরিটি ভোট মেনে নিত না। ভোটবল ছিল পূর্বপ্রান্তের বাঙালি মেজরিটির। অস্ত্রবল ছিল পশ্চিমপ্রান্তের পাঞ্জাবি ও পাঠান মাইনরিটির। একদিন না একদিন একটা বল পরীক্ষা হতোই।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পরিবর্তনটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন ক্রান্তদর্শী পুরুষ। আপন ব্রতে নিবেদিত কর্মবীর। একটি স্বপ্ন নিয়েই তাঁর যাত্রারম্ভ। যাত্রা শেষও সেই স্বপ্নের রূপায়ণে।

সময়ে পদত্যাগ করলে বাঁচতেন তিনি আরও কিছুকাল নিশ্চয়। কিন্তু বাঁচতেন কী নিয়ে? যুক্তবঙ্গের লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তিনিও সে আশা ত্যাগ করেছিলেন। এমনভাবে ত্যাগ করেছিলেন যে তাঁর কারবার ছিল দিল্লির সঙ্গে, কলকাতার সঙ্গে নয়। ভারত সরকারের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে নয়। আমরাও বাংলাদেশে গেলে বাঙালি বলে চিহ্নিত হতুম না, হতুম ভারতীয় বলে, ইন্ডিয়ান বলে। বাংলা সাহিত্যের সম্মেলনেও আমরা বিদেশি অতিথি বলে অভ্যর্থনা পাই, যেমন পান সোভিয়েত রাশিয়ার বা পূর্ব জার্মানির প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সাবধান ছিল যাতে কেউ কখনো মনে না করে বাঙালিতে বাঙালিতে তলে তলে একটা একতার চেষ্টা হচ্ছে। তাই আমাদের প্রতি তাঁদের একটা ছাড়া ছাড়া ভাব।

ওদিকে আবার একদল সক্রিয় ছিলেন মুসলমানে মুসলমানে একতার চেষ্টায়। শেখ সাহেবকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তাদের অবিশ্বাস থেকেই এই ঘাতকতা।

লেখক: বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, বিখ্যাত লেখক ও কবি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহুলপঠিত, শ্রুত ও উদ্ধৃত 'বঙ্গবন্ধু' ছড়াটি তাঁর লেখা। তাঁর বেশির ভাগ কবিতা, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু উপস্থাপিত হয়েছেন বহুভাবে, বহুবর্ণে। তাঁর জন্ম ভারতের ওড়িশায় ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ। ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন

শেখ হাসিনা যেভাবে জানতে পেরেছিলেন

হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী

পনেরো আগস্ট ভোরবেলা টেলিফোন বেজে উঠল। ঘুমিয়ে ছিলাম। টেলিফোন ধরলাম। অপর কণ্ঠ থেকে– স্যার, আমি ফারুক বলছি, লন্ডন থেকে। খবর শুনেছেন স্যার?

কী খবর?

ঢাকার খবর।

কী হয়েছে ঢাকায় আবার?

স্যার, ঢাকায় অভ্যুত্থান হয়ে গেছে, শেখ সাহেবের ভাগ্যে কী ঘটেছে এখনো অনিশ্চিত স্যার।

বলো কী?

সম্ভবত স্যার শেখ সাহেব মারা গেছেন। ফারুক আহমেদ চৌধুরী তখন লন্ডনে ডেপুটি হাইকমিশনার। ফোন রেখে স্ত্রী মাহজাবিনকে বললাম। মাহজাবিন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমিও না। তবুও ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম। ব্রাসেলসে ফোন করলাম রাষ্ট্রদূত সানাউল হক সাহেবকে। জানতে চাইলাম, ঢাকার খবর কী? রাষ্ট্রদূত নীরব। কথা বলছেন না। একপর্যায়ে টেলিফোন রেখে দিলেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে খবর দিতে চান না বলে মনে হলো। ভাবনায় পড়ে গেলাম, কী করি। আবার ফোন করলাম। রাষ্ট্রদূত ধরতেই বললাম, পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত হাসিনা-রেহানাদের যেন না জানায়।

তাকে আরও বললাম, যে কোনো সাহায্যের জন্য আমাকে জানাতে যেন ভুল না হয়। আমি যে কোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত। টেলিফোন রেখে বিবিসি শুনতে গেলাম। রেডিয়ো অন করতেই শোনা গেল–বাংলাদেশে অভ্যুত্থান হয়ে গেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য বিবিসি এ কথাও বলল, খবরটি এখনো অসমর্থিত। রেডিয়ো বন্ধ করে ভাবছিলাম কী করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভেসে উঠল বারবার। মনে পড়ল শেখ সাহেবের কথা। প্রথমদিন দেখা হতেই শেখ সাহেব আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন। একপর্যায়ে বলেছিলেন, ঘটনাবলি

ভালো যাচ্ছে না। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, শেখ সাহেব তাঁর মৃত্যুর আগামবার্তা পেয়ে গেছেন। কয়েক ঘণ্টা পর ব্রাসেলস থেকে সানাউল হকের টেলিফোন। খুব অস্থির, হাসিনা-রেহানাকে নিয়ে যেন খুব ঝামেলায় আছেন। ওদের তাড়িয়ে দিলেই বাঁচেন মনে হলো। বললেন, জানো হুমায়ূন, প্যারিস থেকে আবুল ফতেহ গাড়ি পাঠায়নি। কথা ছিল গাড়ি পাঠাবে, ওদের নিয়ে যাবে। এখনো গাড়ি আসেনি। ফতেহকে পাওয়া যায়নি। ওর বাসায় কেউ টেলিফোন ধরছে না। প্যারিসে শফি সামিকে টেলিফোন করলাম। শফি তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। শফিকে বললাম, রাষ্ট্রদূত ফতেহকে পাওয়া যাচ্ছে না। শেখ সাহেবের মেয়ে আসার কথা প্যারিসে। ওরা যদি আসে, ওদেরকে আদর-যত্ন করো। ও বলল, ঠিক আছে। আমার বাড়িতে রাখব। শফির স্ত্রী আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আবার ফোন করলাম ব্রাসেলসে। সানাউল হককে বললাম, ওদের গাড়ি দিয়ে জার্মানি সীমান্তে অন্তত পৌঁছে দেন।

সানাউল হক রাজি হলেন না। বিস্মিত হলাম। কী বলছেন আপনি। এইটুকু মমতাবোধও নেই। অথচ শেখ সাহেব তাকে খুব স্নেহ করতেন। অনেকের অমতে তাকে রাষ্ট্রদূতও বানিয়েছিলেন। সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও তার নেই। আমি ক্ষুব্ধ হলাম। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এই ভদ্রলোক কি এমন আচরণ করতে পারতেন? বঙ্গবন্ধুর মেয়েদের জন্য গাড়ি দিতে রাজি নন। বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া দূরের কথা। কী বলব, এই ভদ্রলোকই পরবর্তী সময়ে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। যাকগে ওসব কথা। সানাউল হককে বললাম, আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। ওরা আমার জার্মানির বাড়িতে আসবে। আমি তাদের আশ্রয় দেব। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমার চাকরির কোনো মায়া নেই। মানবতা আমার কাছে মুখ্য। আমার বাবা-মা মানুষের সেবা করতে শিখিয়েছেন। বলেছেন, মানুষের বিপদে-আপদে যেন ছুটে যাই। ফলাফল কী হবে জেনেও আমি ওদের জার্মানি আনার ব্যবস্থা করলাম। পনেরো আগস্ট সন্ধ্যায় ওরা জার্মানি পৌঁছাল। ওইদিনই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের জার্মানি পৌঁছার কথা। সঙ্গে থাকবেন পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালক রেজাউল করিম। বেলগ্রেড থেকে কামাল হোসেন আসছেন। আমি বিমানবন্দরে গিয়ে তাকে স্বাগত জানালাম। ড. কামাল তখনও ঢাকার খবর জানেন না। আমি তাদের বাসায় নিয়ে গেলাম। কামাল হোসেন খুবই অস্থির, কথা বলতে পারছেন না। হাসিনা-রেহানাদের আগেই ড. কামাল জার্মানি পৌঁছেছেন। সারা দিনই কাটালাম রেডিয়ো শুনে। যখন জানতে পারলাম খন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তখন আবারও মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। তখন থেকেই তিনি নানা ষড়যন্ত্র করছিলেন। মোশতাক চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন।

শেখ সাহেবের মেয়েরা যখন আমার বাসায় পৌঁছাল, তখন কী দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়। জীবনে অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এমন হইনি কখনো। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। হিমশীতল পরিবেশ। একপর্যায়ে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নায় বাড়ির নিস্তব্ধতা কেটে গেল। ঢাকায় ফোন করলাম। কোনো টেলিফোনই কাজ করছে না। ঢাকার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে টেলিগ্রাম পাঠালাম বিস্তারিত জানার জন্য। কোনো উত্তর এলো না। লন্ডনে ফোন করলাম। তারা বলল, রেডিয়ো রিপোর্ট ছাড়া কিছু জানে না। হাসিনা-রেহানা জানত না ঢাকায় শেখ পরিবারের সবাই মারা গেছেন। তাদের সবকিছু জানানো হয়নি। আমার বাসায় তিনটি রেডিয়ো ছিল। একটি রেডিয়ো ছাড়া বাকি দুটি আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রেখে দিলাম। কীভাবে যেন হাসিনা-রেহানা জেনে গেল, শেখ সাহেব মারা গেছেন। এই খবর শোনামাত্র ড. ওয়াজেদ বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমার মনে আছে, শেখ হাসিনা আমাকে বলেছিল, জানি জানি, কামাল-জামালও চলে গেছে। হাসিনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলছিল, চাচা, আমার মা ও রাসেলকে আমাদের কাছে আনার ব্যবস্থা করুন।

> এক জার্মান মহিলা মিশনে ঢুকে বললেন, তোমরা কেমন জাতি, তোমাদের নেতাকে হত্যা করতে পার, তোমরা এক অসভ্য জাতি। ভদ্রমহিলা কোনো অবস্থাতে থামতে রাজি নন। ১২ বছরের এক বালককে নিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কীভাবে এ বয়সের বালককে হত্যা করতে পার

রাত তখন ১০টা। আমি জানতাম বেগম মুজিব মারা গেছেন।

তবু আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি দেখছি কী করা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা কীভাবে যেন নিশ্চিত হয়ে গেল, বেগম মুজিবও নেই। কী বলব ওদের অবস্থার কথা। হাসিনার অনুরোধেই আমি টেলিগ্রাম পাঠালাম ঢাকায়, শেখ রাসেলকে যেন জার্মানিতে পাঠানো হয়। আমার ধারণার বাইরে ছিল, এই অল্প বয়সের শিশুটিকেও হত্যা করা হয়েছে। কোনো জবাব এলো না ঢাকা থেকে। জার্মান সরকারকে জানালাম, আমার বাসায় শেখ সাহেবের দুই মেয়ে, মেয়ের জামাই ও দুই নাতি-নাতনি রয়েছে। জার্মান সরকার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাসার সামনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিস্তারিত জানতে চাইল। তাঁরা বলল, এক্সিলেন্সি, আমরা আপনার সাহসী ভূমিকাকে উৎসাহিত করছি। তবু আপনি নিজে কোনো ঝামেলায় পড়েন কি না খেয়াল রাখবেন। বললাম, কোনো অসুবিধা হবে না। মানবিক দায়িত্ব পালন করছি। মনে আছে, ডেস্ক অফিসার আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন নিশ্চিত না হই, অসুবিধা হবে না, এ কথা ভেবে। তার ভাষায়, অসুবিধা হতে পারে। সতর্ক থাকবেন। আমাদের জানাবেন সবকিছু।

একপর্যায়ে হাসিনা জানতে চাইল, কে এই ঘটনার নায়ক। আমি বললাম, রেডিয়ো রিপোর্ট থেকে শুনেছি খন্দকার মোশতাকের কথা। হাসিনা কোনোমতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। আব্বার সঙ্গে মোশতাক চাচা কত ঘনিষ্ঠ। পরিবারের একজন সদস্যের মতো। তিনি এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারেন না। হাসিনা অবিশ্বাস করলে কী হবে, মোশতাকই এ ঘটনার নায়ক। অভ্যুত্থানের সুবাদে প্রেসিডেন্ট।

সারা দুনিয়া থেকে টেলিফোন আসা শুরু হলো আমার কাছে। তারা জানতে চাইল শেখ পরিবারের দুই সদস্যের কথা। সংবাদপত্র থেকেও ফোনের পর ফোন। এক জার্মান মহিলা মিশনে ঢুকে বললেন, তোমরা কেমন জাতি, তোমাদের নেতাকে হত্যা করতে পার, তোমরা এক অসভ্য জাতি। ভদ্রমহিলা কোনো অবস্থাতে থামতে রাজি নন। ১২ বছরের এক বালককে নিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কীভাবে এ বয়সের বালককে হত্যা করতে পার। রাষ্ট্রদূত হিসাবে পরিচয় দিতে তখন লজ্জা লাগছিল। এই যখন অবস্থা, তখন জার্মান প্রবাসী কিছু বাংলাদেশি যুবক এসে ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। তারা বলল, আমি কেন শেখ সাহেবের মেয়েদের ঠাঁই দিয়েছি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন তাদের বাসা থেকে বের করে দিই। তা না হলে আমাকে তারা দেখে নেবে। তারা কয়েকটি পাসপোর্ট বের করে বলল, তাতে যেন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সিল মেরে দিই। তাদের ধারণা, বাংলাদেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র হয়ে গেছে। ১৬ আগস্ট ড. কামাল হোসেন লন্ডনের পথে পাড়ি দিলেন। আমার বাসায় যে কক্ষে ড. কামাল উঠেছিলেন, সেটি খালি করা হলো। আমার এক ভাগনে এসে হাজির। সুঠাম দেহের অধিকারী ভাগনে যখন তার কক্ষে যাচ্ছিল, তখন শেখ সাহেবের এক মেয়ে তাকে দেখে ফেলে। তারা ভাবে অন্য কেউ হয়তো এসেছে তাদেরকে হত্যা করতে। সারা রাত তারা ঘুমায়নি। ড. ওয়াজেদ আমাকে জার্মানির সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুরোধ জানালেন। তার ধারণা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের আশ্রয় দেবে। আমি জানালাম, আশ্রয় নিতে চাইলে সোভিয়েত কেন জার্মানিতেই হবে। এটা কোনো সমস্যা নয়। ইচ্ছা করলে লন্ডনেও যাওয়া যেতে পারে। একসময় ভারতীয় হাইকমিশনার মি. রহমান টেলিফোন করে শেখ পরিবারের সদস্যদের কুশলাদি জানতে চাইলেন। বললাম, তারা ভালো আছে, আমি দেখাশোনা করছি। তিনি বললেন, মিসেস গান্ধী খুব খুশি হয়েছেন আমি আশ্রয় দিয়েছি জেনে। হাসিনাকে বললাম, ভারতীয় হাইকমিশনার মি. রহমান দেখা করতে চান তার সঙ্গে। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। আমি গরহাজির থাকলাম। ড. ওয়াজেদ সবাইকে নিয়ে গেলেন কালশোতে। সেখানে শিক্ষা সফরে এসেছিলেন তিনি। কিছুদিন পর ভারতীয় হাইকমিশনার জানালেন, শেখ পরিবারের সদস্যরা নিরাপদে, সুস্থভাবে বসবাস করছেন দিল্লিতে। ২৫ আগস্ট জেনেভা থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবু সাঈদ চৌধুরী টেলিফোনে জানালেন, মোশতাক সাহেব খুবই ক্ষিপ্ত– কেন আমি হাসিনা-রেহানাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম। আবু সাঈদ বললেন, প্লিজ, আপনি ঢাকা যাবেন না। গেলে বিপদ হবে। দুদিন পর ঢাকা থেকে বার্তা, আমাকে ওএসডি করা হয়েছে। জার্মান বন্ধুরা বলল, ঢাকায় যাওয়ার দরকার নেই। জার্মানিতেই আপনার চাকরি হবে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মি. এইচআর ডিঙ্গেলস বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আমরা আছি।

লেখক: একজন কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সময় জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সবাই যখন খুনিদের ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তখন তিনি ভাগ্যচক্রে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে আশ্রয় দেন। তিনি ১৯২৮ সালের ১১ নভেম্বর সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০১ সালের ১০ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন

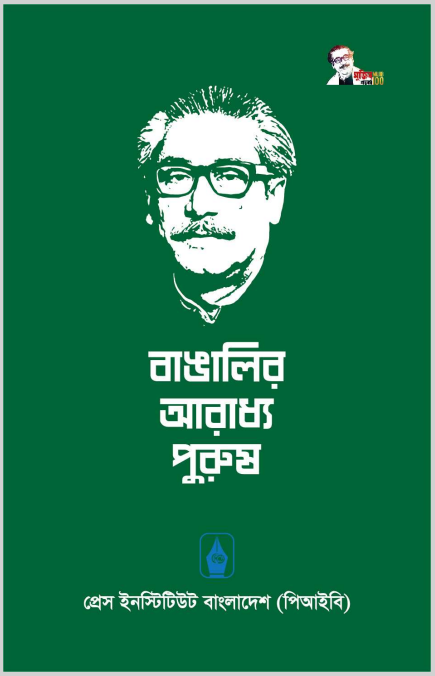

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর

আগের এবং পরের কয়েকটি তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনা

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

প্রতিবছর আগস্ট মাসটি এলেই নিজের পুরোনো ডায়েরি পড়া আমার একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডটি আমার মনে এখনো একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। স্বাধীনতা লাভের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় এমন মর্মান্তিক নিষ্ঠুর একটি ঘটনা কি ঘটানো সম্ভব? কেন ঘটল? কারা ঘটাল? এই প্রশ্নগুলোর অনেক সরল ও সহজ উত্তর বছরের পর বছর আমরা শুনেছি। এখনো শুনছি। কিন্তু তা কতটা সত্য এবং কতটা রাজনৈতিক প্রচারণা? এই প্রশ্নটিও মাঝে মাঝে আমাকে দিশেহারা করে। তখন আমি–বিশেষ করে আগস্ট মাসে নিজের ডায়েরির পাতা উলটায়। একসময় যে খবর ও ঘটনাগুলোকে তুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনা বা খবর হিসাবে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছি, পরে দেখেছি, সেগুলোই আমার কাছে অনেক অর্থবহ ও মূল্যবান হয়ে উঠেছে। মনে হয়, আমার অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব এই খবর ও ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অনেক লুকানো সূত্রও যেন এই একসময়ের তুচ্ছজ্ঞান করা খবরগুলোর মধ্যে রয়েছে। আমি তা থেকে যেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের একটা সাজানো ছবি এবং এর নেপথ্য নায়কদের কিছুটা প্রতিভাস খুঁজে পাই। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে। সেজন্যই আজকের লেখায় এই পুরোনো ডায়েরি চর্চা।

কাছে-দূরের পাঠকদের জন্য আগেই একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করি। আজকের লেখাটি আদপেই কোনো লেখা নয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার সময়ের এবং তার কিছু আগে ও পরের ঘটনা এবং তখনকার খবরের কাগজের কিছু খবরের উদ্ধৃতি আমার ১৯৭৫ সালের ডায়েরিতে যেভাবে রয়েছে, তা সংক্ষেপে এখানে সাজিয়ে দিয়েছি। পাঠকরাই তখনকার এই ছোটো ও তুচ্ছ ঘটনাগুলো বিচার ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এই নির্মম হত্যাকাণ্ড

কেন ঘটানো হয়েছিল? এবং এই ঘটনা ঘটানোর পেছনে এক না একাধিক ব্যক্তি কাজ করেছে? এর উদ্দেশ্য কী ছিল, একজন ব্যক্তি বা পরিবারকে হত্যা, না একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক সাফল্য ও সম্প্রসারণকে ব্যর্থ করে দেওয়া? প্রচলিত যে ধারণা, চীন, সৌদি আরব ও সিআইএ-এর মদতে পাকিস্তান মিলিটারি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল পাকিস্তানপন্থি উচ্চাভিলাষী অফিসার, তাদের ভাড়াটে কিছু অবসরপ্রাপ্ত জুনিয়র সামরিক অফিসার এবং আওয়ামী লাগের মোশতাক ও মোশতাকপন্থি কিছু লোকের যোগসাজশেই শুধু ঘটনাটি ঘটেছে; না, এর পেছনে ভারতের ইন্দিরা সরকারের ভেতরের একটি শক্তিশালী ইন্দিরা-বিরোধী লবি এবং চরম ডানপন্থি দলগুলোরও কোনো কোনোটি সাহায্য ও সহযোগিতা জুগিয়েছে? আমি নিজে এই প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দিতে চাই না। কারণ, তা হবে আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ। আমি তাই পুরোনো ডায়েরির কিছু খবর আংশিকভাবে এখানে তুলে ধরছি। আমার বিশ্বাস, খবরগুলোকে যত তুচ্ছ মনে হোক, যে কোনো পাঠক এই খবরগুলো থেকে তার নিজের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

আমার ডায়েরি বলে, মুজিব হত্যার বহু পূর্ব থেকে পশ্চিমা কাগজগুলোয় মুজিববিরোধী প্রচারণা শুরু হয়। একটি নমুনা:

৬ জানুয়ারি সোমবার ১৯৭৫: আজ লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় পিটার জিল শেখ মুজিবকে রাজা ক্যানিউটের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, তিনি অযোগ্য। তার শাসন থেকে বাংলাদেশ যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়, তত ভালো। He is best liability of Bangladesh.

৮ মার্চ শনিবার: লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এশিয়ার সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেতা হচ্ছেন দুজন–চৌ এন লাই এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। বাংলাদেশ হলো Land of human tragedy. বাংলাদেশ হারিয়ে নতুন ও ছোটো পাকিস্তান লাভবান হয়েছে; বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

বিদেশে পাকিস্তানি তৎপরতা

২০ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭৫: বাংলাদেশ থেকে পলাতক এবং ভুট্টো মন্ত্রিসভার বাঙালি সদস্য মাহমুদ আলী এখন লন্ডনে। লন্ডনের বাংলা কাগজ 'জনমত'-এর খবর, তাকে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে মুজিব-সরকারবিরোধী তৎপরতা গড়ে তোলার জন্য পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানি দূতাবাসের অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশবিরোধী বাঙালিদের দ্বারা দুটো সাপ্তাহিক বাংলা কাগজ লন্ডনে বের করা হয়েছে।

২৪ মার্চ সোমবার: আজ পূর্ব লন্ডনে মাহমুদ আলী কিছু বাঙালিকে নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় তিনি শেখ মুজিবকে মীরজাফর বলে অভিহিত করেন। সভায় একটি বেনামা ইশতাহার বিলি করা হয়। তাতে বলা হয়, শেখ মুজিবের জন্মদিনে ঢাকায় বেলা ৪টার দিকে সচিবালয়ের গেট বন্ধ করে দিয়ে লোকজন আটকে রেখে জন্মদিনের সভা করা হয়। মিষ্টি বিতরণ করা হয় ষোলো মন।

কিছু কাকতালীয় ঘটনা

১৯ জানুয়ারি রবিবার ১৯৭৫: চীনে আজ নয়া সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে প্রেসিডেন্ট পদ বিলোপ করা হয়। পার্টির চেয়ারম্যানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সশস্ত্রবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক ঘোষিত হয়েছেন। আগের সংবিধানে যেটুকু নাগরিক অধিকার ছিল, তাও বাতিল করা হয়েছে।–খবর

২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার: রাতে 'ইত্তেফাক' অফিসে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর কক্ষে আড্ডা (আমি লন্ডন থেকে কিছুদিনের জন্য ঢাকায়)। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভা হয়েছে বিকেলে। মঞ্জু জানালেন, দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শেখ সাহেবকে। তিনি ২৫ তারিখে সংসদে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

মঞ্জু হেসে বললেন, চীনেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। ঢাকায় কয়েকটি পিকিংপন্থি দল বাংলাদেশে একদলীয় ও এক ব্যক্তির শাসন প্রবর্তনের উদ্যোগের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। কিন্তু মাত্র একদিন আগে চীনে যে নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা নীরব।

আমি বললাম, চীনে নতুন সংবিধান ঘোষণার একদিন পরই বাংলাদেশেও সংবিধান পরিবর্তনের উদ্যোগ, এটা কি কাকতালীয় ঘটনা, না এই দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে?

মঞ্জু নীরব। কোনো জবাব দিলেন না।

৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার: ভারতের জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও লোকদল দিল্লির বাংলাদেশ মিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।–খবর

রাতে 'ইত্তেফাক'-এর আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ধানমন্ডির বাসায় আমন্ত্রণ। 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর হারভে স্টকউইনের সম্মানে ভোজ। রাত ১২টা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা। একসময় হারভে স্টকউইন বললেন, বাংলাদেশের সংসদে ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিব যে বাকশাল শাসন প্রবর্তন করেছেন, তাতে আমেরিকান প্রশাসন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। শেখ মুজিব কাজটা ঠিক করেননি। তিনি একটি বড়ো এবং নিষ্ঠুর শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছেন। যা তারই ভয়ানক ক্ষতি করবে।

জিজ্ঞেস করলাম, এই বড়ো শত্রুটি কি আমেরিকা?

স্টকউইন বললেন, হ্যাঁ। শেখ মুজিব শেষপর্যন্ত কেন পূর্ব ইউরোপীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে সোভিয়েত শিবিরের সঙ্গে তার মৈত্রী আরও জোরদার করতে চান, তা আমি জানি। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। প্রেসিডেন্ট মুজিবের ধারণা, আমেরিকাকে তুষ্ট করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আমেরিকার প্রশাসন তাকে উৎখাত করতে চায়। সেজন্যই বাংলাদেশে বড়ো রকমের খাদ্যাভাবের মুখে প্রতিশ্রুত চাল পাঠাতে ঢিলেমি করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চেষ্টা তারা করছে। সুতরাং তিনি চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন। অন্যদিকে আমেরিকান প্রশাসনও বুঝেছে, মুজিব চাপে বা ভয়ে ধীরে ধীরে তাদের শিবিরের দিকে ফিরবে, সে আশা আর নেই। তারাও এবার চরম আঘাত হানতে চাইবে। আর এ কাজ সফল করার জন্য এগিয়ে যেতে হাতের পাঁচ পাকিস্তান তো প্রস্তুত হয়েই আছে।

স্টকউইন বললেন, এত বড়ো শত্রুকে চটিয়ে শেখ মুজিব ভুল করলেন। তাকে উৎখাত করা সম্ভব হলে সেকেন্ড টার্গেট হবেন ইন্দিরা গান্ধী। উপমহাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হবে।

৭ মার্চ শুক্রবার: লন্ডনের বিবিসি টেলিভিশনে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের ওপর ভয়াবহ ছবি দেখানো হচ্ছে। বাঙালি অধ্যুষিত ব্রিকলেন এলাকায় মুজিববিরোধী শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পলাতক কিছু রাজাকার, লন্ডনে পালিয়ে থাকা জামায়াতি ও মুসলিম লীগপন্থি নেতা এবং পিকিংপন্থি নামে পরিচিত কিছু বাঙালি যুবক।

১০ মার্চ সোমবার: লন্ডনের 'ইকোনমিস্ট' পত্রিকা 'দ্য লাস্ট কার্ড অব শেখ মুজিব' নামক নিবন্ধে বলেছে, 'একদলীয় শাসনই হচ্ছে শেখ মুজিবের শেষ খেলা। তাকে এখন ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হবে। তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য সন্তোষে গিয়ে মওলানা ভাসানীর কাছে ধরনা দিয়েছেন। মওলানা ভাসানী তার দ্বিতীয় বিপ্লবে সমর্থন দিয়েছেন। তাতে কোনো ফল হবে না।'

২৪ মে শনিবার: ২০ মের লন্ডনের কাগজের খবর ছিল, ক্যান্টনের বাণিজ্য মেলায় চার সদস্যের বাংলাদেশি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে চীন স্বাগত জানিয়েছে এবং একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইদরিস।

ওপরের খবরের ওপর একটি প্রতিবেদন ঢাকা থেকে গার্ডিয়ান পত্রিকায় পাঠান তাদের প্রতিনিধি পল বোচার (Paul Bocher)। আজ ২৪ মে তা গার্ডিয়ানে ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনটির হেডিং: 'Dacca Editor's arrest strangely timed'. প্রতিবেদনে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সূচনায় সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খানকে গ্রেফতার করার পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়। আরেক খবরে বলা হয়, 'চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে শেখ মুজিবের প্রচেষ্টাকে ভারতের শক্তিশালী ডানপন্থি দলগুলো এবং ইন্দিরা সরকারের ভেতরের একটি গ্রুপ ভালো চোখে দেখছে না। দিল্লির একটি পত্রিকা বলেছে, শেখ মুজিবের আর বিশ্বাস করা যায় না।'

৩১ মে শনিবার: লন্ডনের কাগজের খবর, জাসদের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রুপ তাদের গোপন ঘাঁটি থেকে 'লড়াই' নামে একটি পত্রিকা বের করেছে। তাতে শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাতের এবং জনযুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। কুষ্টিয়ায় রীতিমতো অপারেশন চালিয়ে আবদুল হকের একটা গ্রুপকে দমন করতে হয়েছে। তাদের কাছে যে অস্ত্র পাওয়া গেছে, তা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করার আগে ওই গ্রুপের হাতে তুলে দিয়েছে বলে ধৃত কয়েক ব্যক্তি স্বীকারোক্তি করেছে।

১৮ জুন বুধবার ১৯৭৫: আমি আবার ঢাকায়। আজ আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বাড়িতে বিরাট পার্টি। সাড়ে ৭টায় তার ধানমন্ডির বাড়িতে পৌঁছিলাম। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বোস্টার, তার পত্নী, সস্ত্রীক ব্রিটিশ ফার্স্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ফরেন অফিসের তোবারক হোসেন ও তার পত্নী, ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, ওবায়দুর রহমান, রফিকুল্লা চৌধুরী, বিশ্বশান্তি পরিষদের আলি আকসাদ ও তার স্ত্রী, মোতাহার হোসেন সিদ্দিকি এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমার ডায়েরিতে উল্লেখ নেই, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।

আমি একটু দেরিতে পার্টিতে উপস্থিত হই। গিয়ে দেখি, একই সোফায় বসে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বোস্টার এবং আলি আকসাদ গল্প করছেন। আমি তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঠাট্টা করে বললাম, রুশ-মার্কিন আতাঁত কবে থেকে শুরু হলো আলি আকসাদ? বোস্টার ও আলি আকসাদ দুজনই হাসলেন, জবাব দিলেন না।

অদূরে আরেকটি সোফায় খন্দকার মোশতাক, ওবায়দুর রহমান, রফিকুল্লা চৌধুরী বসে ফিসফাঁস করে কথা বলছিলেন। আমি আবারও ঠাট্টা করলাম। এবার খন্দকার মোশতাককে বললাম, মোশতাক ভাই, কী ষড়যন্ত্র করছেন?

খন্দকার মোশতাক হঠাৎ চটে গেলেন। বললেন, তোমার খুব বাড় বেড়েছে। যেখানে-সেখানে ষড়যন্ত্র দেখে বেড়াও! কথাবার্তার একটা সীমা থাকা দরকার।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। খন্দকার মোশতাক সাধারণত লঘু ঠাট্টায় চটেন না। বললাম, মোশতাক ভাই, আমি ঠাট্টা করেছি।

মোশতাক আরও চটে গেলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কি ঠাট্টার সম্পর্ক? আমি তার কাছে মাফ চাওয়ার পরও তিনি রাগে অনেকক্ষণ ফুঁসতে ছিলেন।

২৬ জুন বৃহস্পতিবার: দুপুর দুটায় ডাক পড়ল নতুন গণভবনে প্রেসিডেন্ট মুজিবের কক্ষে। তিনি একাই বসা ছিলেন। তার কক্ষে ঢোকার আগেই জেনে ফেলেছি ভারতে ইন্দিরা সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে আগেই তা ঘোষিত হয়েছে। ভারতে

আলাপ হলো ঢাকায় নিযুক্ত সোভিয়েত টিভি ও রেডিয়োর চিফ অব ব্যুরো লিওনিদ ও অরলোভের সঙ্গে। তিনি বললেন, চিলিতে আলেন্দে সরকারকে উৎখাতের জন্য প্রথমে অর্থনৈতিক সাবোটাজ, পরে রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের যে নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল, বাংলাদেশেও তা অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মুজিবকে সতর্ক করা যাচ্ছে না

জরুরি অবস্থা (অভ্যন্তরীণ) ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জয় প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাইসহ বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কক্ষে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'ইন্ডিয়ার খবর শুনেছ?' জবাবে হেসে বললাম, গোখলের কথাটাই ঠিক হলো, 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো।'

আমার কথা শুনে বঙ্গবন্ধু হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন।

২৭ জুন শুক্রবার: বিকেলে বাসায় ফেরার পথে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে দেখা। তিনি ডেকে নিলেন 'ইত্তেফাক' অফিসে। সেখানে পরিচয় হলো হল্যান্ডের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মি. পি. আর. ব্রাউভারের (P.R. Browver) সঙ্গে। তিনি বললেন, তার আশঙ্কা, বাংলাদেশের জন্য এক বড়ো রকমের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। তিনি তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে চাইলেন না।

রাতে বজলুর রহমানের (বর্তমানে দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) আমন্ত্রণে চুংকিং রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে আলাপ হলো ঢাকায় নিযুক্ত সোভিয়েত টিভি ও রেডিয়োর চিফ অব ব্যুরো লিওনিদ ও অরলোভের সঙ্গে। তিনি বললেন, চিলিতে আলেন্দে সরকারকে উৎখাতের জন্য প্রথমে অর্থনৈতিক সাবোটাজ, পরে রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের

যে নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল, বাংলাদেশেও তা অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মুজিবকে সতর্ক করা যাচ্ছে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস, বাইরের সাহায্য ছাড়াই তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবেন।

মহাপ্রলয়ের আগের দিনটিতে

১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৭৫: ২৫ জুলাই লন্ডনে ফিরে এসেছি।...বিকেলে গেলাম বাংলাদেশ হাইকমিশনে। প্রেস কাউন্সিলর এম আর আখতার মুকুল উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, দিল্লি থেকে টেলেক্স মেসেজ এসেছে, শামসুল হক বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতের প্রেসিডেন্টের কাছে পরিচয়পত্র দিয়েছেন, এই খবরটা ভায়া লন্ডন ঢাকায় পাঠাতে হবে। কারণ, দিল্লি-ঢাকা টেলেক্স লাইন (তখন ফ্যাক্স হয়নি) খারাপ। মুকুল চেষ্টা করলেন, লন্ডন থেকে ঢাকায় টেলেক্স মেসেজ পাঠাতে। অপারেটর জানাল, লন্ডন-ঢাকা লাইন কাজ করছে না।

তখন লন্ডন সময় বিকেল ৫টা। ঢাকায় সময় রাত ১০টা। অর্থাৎ হত্যা প্রস্তুতি আগের দিন থেকেই চলছিল।

মহাপ্রলয়ের পর

১৭ আগস্ট রবিবার ১৯৭৫: সানডে টেলিগ্রাফ আজ খবর দিয়েছে, 'শেখ মুজিব অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি এক্সিকিউটেড ওয়ান বাই ওয়ান' (প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লিড নিউজ)।

১৮ আগস্ট সোমবার: ডেইলি টেলিগ্রাফের ঢাকাস্থ সংবাদদাতার বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে আজ পত্রিকাটির চারের পৃষ্ঠায়। তার ব্যানার হেডিং হলো: 'পাকিস্তান ট্রেইন্ড ট্রুপস লেড বাংলাদেশ কু'। খবরের ভেতরে ঢাকায় পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের তৎপরতার খবরও বলা হয়েছে।

২৪ আগস্ট রবিবার: আজ পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকার খবর, শেখ মুজিব হত্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো মুসলিম দেশগুলোর কাছে জরুরি তারবার্তায় বাংলাদেশের মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল, খাজা খয়েরুদ্দিনকে (ঢাকার নবাব পরিবারের উর্দুভাষী নেতা এবং তখন পাকিস্তানে পলাতক) বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট করার। ভুট্টোর সঙ্গে খাজা খয়েরুদ্দিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

২৫ আগস্ট সোমবার: লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ ঢাকা থেকে পিটার জিলের পাঠানো সংবাদ ছেপেছে আজ। তাতে পিটার জিল বলেছেন, মোশতাক জনগণের কাছে এত নিন্দিত যে, তার সরকার চার মাসও টিকবে না। তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বোস্টারের কাছে তার নিরাপত্তার আশ্বাস চেয়েছেন। তাকে খুনি মেজরদের 'পেজ বয়' আখ্যা দেওয়া হয় খবরটিতে।

আরেক খবরে বলা হয়, নতুন প্রশাসনের সমর্থক বলে যারা বিবেচিত, তাদের উচ্চপদে বসানো হচ্ছে। চিফ অব স্টাফ করা হয়েছে। আইয়ুব-মোনেম আমলের প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজমকে করা হয়েছে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। আরেক আমলা আসফউদ্দৌলাকে করা হয়েছে ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান।

২ সেপ্টেম্বর বুধবার: পাকিস্তানের পত্রপত্রিকার খবর উদ্ধৃত করে লন্ডনের কাগজে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক বলেছেন, আমরা শেখ মুজিবের ছয় দফা মেনে নিয়েছিলাম; কিন্তু আর্মি মানতে চায়নি ও দেয়নি।

করাচির 'লিডার' (সান্ধ্য দৈনিক) পত্রিকায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের আগে ইয়াহিয়া সরকার কয়েকজন বাঙালি নেতার সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী ও ড. জিডব্লিউ চৌধুরী। দুজনই ইয়াহিয়াকে বলেছেন, সামান্য গোলমাল হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

৩ সেপ্টেম্বর বুধবার: ঢাকার কাগজের খবর, 'বাংলাদেশে মুজিব সরকারের পতন ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হলো' বলে বিবৃতি দিয়েছেন ড. আলীম আল রাজী, মশিউর রহমান জাদু মিয়া, রাশেদ খান মেনন ও মাওলানা সুধারামী।

ভারতের প্রতিক্রিয়া ও ডান-বাম

২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭৫: ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া ম্যাগাজিনে এক প্রবন্ধে খুশওয়ান্ত সিং মন্তব্য করেছেন, 'মুজিবের পতনের জন্য তিনি নিজেই দায়ী।' ইন্ডিয়ার ডিফেন্স অব স্টাডিজ অ্যান্ড এনালাইসিসের ডেপুটি ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার আর সাহানী বলেছেন, 'বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনে ভারত সরকারের উদ্‌বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। এই পরিবর্তন ভারতের নিরাপত্তার জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধ দেখা দিলে বাংলাদেশ চীন বা পাকিস্তানের পক্ষ নেবে না।'

এই বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছেন মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার মোহিত সেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ সীমান্ত এখন ভারতের জন্য অবন্ধু সীমান্ত হয়ে গেছে। ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা মিসেস গান্ধীর জন্য হুমকি ছাড়া আর কিছু নয়। শিগগির ভারতেও পটপরিবর্তনের চক্রান্ত হবে। ১৫ আগস্টের ঘটনায় ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত শক্তিশালী হয়েছে।

২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার: আজ লন্ডনের অধিকাংশ কাগজের খবর, বাংলাদেশে দুর্নীতি, দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ প্রভৃতি অপরাধে সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ডদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

'৭১-এর মূলধারা' বইয়ের লেখক মঈদুল হাসান তখন লন্ডনে। তিনি আমাকে টেলিফোন করে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তাজউদ্দীনসহ বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করার জন্যই এই ব্যবস্থা। এদের রক্ষার জন্য লন্ডনে অবিলম্বে লিগ্যাল এইড কমিটি ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার।

৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার: আজ লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ঢাকার 'বাংলাদেশ টাইমস' পত্রিকার সম্পাদকীয়র উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, পত্রিকাটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। সম্পাদকীয়টি স্বনামে লিখেছেন সম্পাদক এনায়েতুল্লা খান (মিন্টু)।

গার্ডিয়ানের ভাষ্যকারের ধারণা, বাংলাদেশে সামরিক শাসন আসছে। এই সম্পাদকীয়তে তারই পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আমি আমার পাঠকদের আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তার আগের ও পরের যেসব বড়ো বড়ো ঘটনার কথা রটনা ও প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলোর কথা আমার ডায়েরিতে থাকা সত্ত্বেও আমি এড়িয়ে গেছি। তখন যেসব খবর ও ঘটনা আমার কাছে সামান্য এবং তাৎপর্যহীন মনে হয়েছিল, তবু ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলাম, সেগুলোই এখানে উল্লেখ করলাম। যারা এই লেখা পড়বেন, তারাই এখন ভেবে দেখুন, এই তুচ্ছ ঘটনাগুলো কোনো বিস্ময় ও তাৎপর্য বহন করে কি না? যদি করে, তাহলে বঙ্গবন্ধু হত্যার কার্যকারণ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাদেরও দেরি হবে না।

লেখক: সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কলাম লেখক। তিনি ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'-এর রচয়িতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য ছিলেন। তিনি ২০২২ সালের ১৯ মে লন্ডনে ইন্তেকাল করেন

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বিপন্ন দিনগুলো

ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

১৫ আগস্ট (১৯৭৫) শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম ভাঙে ম্যাডাম রাষ্ট্রদূতের ডাকে। তিনি জানান যে, জার্মানির বন থেকে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ফোন করেছেন। প্রথমে হাসিনাকে পাঠিয়ে দিই তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে হাসিনা আমাকে জানায় যে, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। হাসিনাকে তখন ভীষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল। আমি দ্রুত নিচে দোতলায় চলে যাই। তখন সেখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মাথা হেঁট করে রাষ্ট্রদূত সাহেব ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেও তিনি কোনো কথা বললেন না। ফোনের রিসিভারটি ধরতেই হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন, "আজ ভোরে বাংলাদেশ 'ক্যু-দে-তা' হয়ে গেছে। আপনারা প্যারিস যাবেন না। রেহানা ও হাসিনাকে এ কথা জানাবেন না। এক্ষুনি আপনারা আমার এখানে বনে চলে আসুন।"

প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে, এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এর বেশি আপাতত আমি আর কিছুই জানি না।' এ কথা বলেই তিনি আমাকে ফোনের রিসিভারটি সানাউল হক সাহেবকে দিতে বলেন। অতঃপর আমি আস্তে আস্তে তিনতলায় আমাদের কক্ষে চলে যাই। সেখানে পৌঁছাতেই হাসিনা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে আমার কাছ থেকে জানতে চায় হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে কী বলেছেন। তখন আমি শুধু বললাম যে, তিনি আমাদের প্যারিস যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে সেদিনই বনে ফিরে যেতে বলেছেন। এ কথা বলেই আমি বাথরুমে ঢুকে পড়ি। সেখানে এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকটা সময় কাটাই। ততক্ষণে রেহানা সজাগ হয়ে আমাদের কামরায় চলে আসে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই রেহানা ও হাসিনা দুজনই কাঁদতে কাঁদতে বলে যে, নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে, যা আমি তাদের বলতে চাই না। তারা আরও বলে যে, প্যারিসে না যাওয়ার কারণ তাদের পরিষ্কারভাবে না বলা পর্যন্ত তারা ওই বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। অতএব, বাধ্য হয়েই আমি তাদের বলি

যে, বাংলাদেশে কী একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্য আমাদের প্যারিস যাওয়া যুক্তিসংগত হবে না। এ কথা শুনে তারা দুবোন কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদের কান্নায় ছেলেমেয়েদেরও ঘুম ভেঙে যায়।

১৫ আগস্ট (১৯৭৫) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আমরা বনের উদ্দেশে ব্রাসেলস ত্যাগ করি। পথে রেহানা ও হাসিনা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আমরা বনে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় পৌঁছাই। সেদিন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন যুগোশ্লাভিয়ায় সফর শেষে বাংলাদেশে ফেরার পথে ফ্রাঙ্কফুর্টে যাত্রাবিরতি করে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় উঠেছেন। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর স্ত্রী, ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী তিনজন মিলে কান্নায় ভেঙে পড়া রেহানা ও হাসিনাকে ধরাধরি করে বাসার ভেতর নিয়ে যান।

ড্রইংরুমে এভাবে কিছুক্ষণ কাটানোর পর হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর স্ত্রী হাসিনাদের উপরতলায় নিয়ে যান। তখন ড্রইংরুমে ড. কামাল হোসেন, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ও আমি ভীষণ উৎকণ্ঠিত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অন্যান্য রেডিয়ো স্টেশন থেকে বাংলাদেশের তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকি। এরই এক ফাঁকে আমি হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই। নিরাপদ স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত হাসিনাদের আমি কোনো কিছু জানতে দেব না, এই শর্তে তিনি আমাকে বললেন, 'বিবিসি-এর এক ভাষ্যানুসারে রাসেল ও বেগম মুজিব ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই।' এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোথায় আশ্রয় নেওয়া নিরাপদজনক হবে তাঁর কাছ থেকে এ কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোনো দেশ আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়।'

পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সকাল ৮টার দিকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য ড. কামাল হোসেন বনস্থ বিমানবন্দরে যাবেন বলে আমাকে জানানো হয়। ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও গাড়িতে উঠে বসি। বিমানবন্দরে ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী দুজনে একত্রে কিছু গোপন আলাপ করেন। অতঃপর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে আমি ড. কামাল হোসেন সাহেবের হাত ধরে তাকে বললাম, খন্দকার মোশতাক আহমেদ খুব সম্ভবত আপনাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাখার চেষ্টা করবেন। অনুগ্রহ করে আমার কাছে ওয়াদা করুন যে, আপনি কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করবেন না। আমার এই প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল হোসেন আমাকে বললেন, ড. ওয়াজেদ, প্রয়োজন হলে বিদেশেই মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আপস করে আমি দেশে ফিরতে পারি না। এই কথাগুলো বলেই তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে যান। বিমানবন্দর থেকে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর বাসায় ফিরে হাসিনার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ইতঃপূর্বে লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর ফুপাতো ভাই মোমিনুল হক খোকা (কাকা) ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি আমাদেরকে লন্ডনে তার কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। একসময় হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর ছোটো ভাই কায়সার রশীদ চৌধুরী তাঁকে ফোন করেন। এই পরিস্থিতিতে খন্দকার মোশতাক আহমেদের বিরুদ্ধে কোনোকিছু না করার জন্য কায়সার চৌধুরী তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেন। কায়সার রশীদ চৌধুরী রেহানা ও হাসিনার সঙ্গে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দেন। অতঃপর হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, রেহানা, হাসিনা ও আমাকে বলেন যে, লন্ডনে চলে যাওয়া সাব্যস্ত করলে আমরা সেখানে তার বাসায় গিয়ে উঠতে পারি। তবে তিনি আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, সেখানে মাত্র একটি সমস্যা আছে। ওই বাসার নিচতলায় কায়সার রশীদ চৌধুরী বসবাস করে এবং সে ভুট্টোর অন্ধ ভক্ত। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো খন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তার সঙ্গে এ ব্যাপারে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য। যা হোক, ওইদিনই হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আমাকে কার্লসরুয়ে পাঠালেন সেখান থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য ভারী জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য।

আমি সেদিন কার্লসরুয়ে গিয়ে বনে ফিরে আসি রাত সাড়ে ১০টার দিকে। কিন্তু সেদিন সাপ্তাহিক ছুটির কারণে অফিস বন্ধ থাকায় আমি কোনো বইপত্র বা অন্য কোনো জিনিসপত্র সঙ্গে আনতে পারিনি। রাত ১১টার দিকে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী তার স্ত্রী ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাইরে যান। পথে তিনি বলেন যে, একটি পূর্বনির্ধারিত স্থানে ভারতীয় দূতাবাসে তার পরিচিত একজন অফিসিয়াল আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমাকে তাদের স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যা হোক, ওই নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর ভারতীয় সেই অফিসিয়ালের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে রেখে দ্রুত বাসায় ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আমাকে পরামর্শ দেন যে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষে রওয়ানা হওয়ার সময় আমি যেন তাকে ফোনে অবহিত করি। অতঃপর ভারতীয় ওই অফিসিয়ালের সঙ্গে আমি তাদের রাষ্ট্রদূতের বাসায় যাই। তখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন মুসলমান জার্নালিস্ট। একটু ভয়ে ভয়ে আমাদের বিপর্যয়ের কথা আমি তাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। আমার কথা শোনার পর তিনি আমাকে লিখে দিতে বলেন যে, আমরা ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে কী চাই। অতঃপর তিনি সাদা কাগজ ও একটি কলম আমার হাতে তুলে দেন। তখন মানসিক দুশ্চিন্তা ও অজানা শঙ্কায় আমার হাত কাঁপছিল। যা হোক, অতিকষ্টে রেহানাসহ আমার পরিবারবর্গের নাম উল্লেখপূর্বক সবার পক্ষ থেকে আমি লিখলাম, শ্যালিকা রেহানা, স্ত্রী হাসিনা, শিশু ছেলে জয়, শিশু মেয়ে পুতুল এবং আমার নিজের কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রাণরক্ষার জন্য ভারত সরকারের কাছে কামনা করি রাজনৈতিক আশ্রয়।

১৭ আগস্ট রোববার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সারাক্ষণ বাসায় ছিলেন। ওইদিন লন্ডন থেকে আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা ও বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় রেহানা ও হাসিনাকে ফোন করেন। একসময় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পত্নী আমাদের ফোন করে জানান যে, তিনি ঢাকায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতঃপূর্বে কথা বলেছেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। রাতে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, তিনি আমাদের কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন কি না। আমি তাকে জানাই যে, হাসিনারা প্রত্যেকে মাত্র পঁচিশ ডলার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কার্লসরুয়ে গেস্ট হাউজে আমি রেহানার জন্য একটি পৃথক কক্ষ ভাড়া নিয়েছি। অতঃপর আমি তাকে হাসিনার সঙ্গে ওই বিষয়ে আলাপ করার জন্য পরামর্শ দিই। তখন হাসিনার সঙ্গে আলাপ করে আমরা হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীকে জানাই যে, মাত্র হাজারখানেক জার্মান মুদ্রা দিলেই আমরা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব।

১৬ আগস্ট ড. কামাল হোসেন লন্ডন চলে যাওয়ার পর হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী দেশের কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট আমলার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক গোপন ও চাঞ্চল্যকর কাহিনি আমাকে শোনান। তিনি বলেন যে, তাঁর ছোটো ভাই কায়সার রশীদ চৌধুরী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর একান্ত সচিব ছিলেন, যখন তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মন্ত্রিপরিষদের পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। ওইসময় জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনেক অপকর্ম ও কুকর্মে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কায়সার রশীদ চৌধুরীর।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে তার ভূমিকা সম্পর্কেও হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আমাকে অনেক কাহিনি শোনান। তিনি তখন দিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন ও তা ঘোষণার পূর্বে তাঁকে দাপ্তরিক কাজে করাচি হয়ে ইসলামাবাদ যেতে হয়েছিল কয়েকবার। তখন পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখত। ১৯৭১-এর আগস্টে দিল্লি থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সফর শেষে ফেরার পথে করাচি বিমানবন্দরে তাঁকে গ্রেফতার করারও নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ইসলামাবাদ থেকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরিত টেলেক্স বার্তাটি করাচিস্থ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তিনি সেবার ভাগ্যক্রমে রেহাই পান। অতঃপর দিল্লি পৌঁছেই তিনি পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি তার সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করেন। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আমাকে আরও জানান যে, ১৯৭১-এ কলকাতায় খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগের জহিরুল কাইউম, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনপ্রধান হোসেন আলীসহ কতিপয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জোর গোপন তৎপরতা চালিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাহত ও নস্যাৎ করার জন্য।

১৯৭৫-এ আগস্টের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু ইতঃপূর্বে ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের যথাক্রমে দলপতি ও সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। যে কারণে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী নিউইয়র্কে ও লিমায় হোটেলও রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৫ আগস্টের ঘটনার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করায় তার লিমা সম্মেলনে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর দৃঢ়বিশ্বাস যে, খন্দকার মোশতাক আহমেদ তাকে কোনো অবস্থাতেই লিমা সম্মেলনে যেতে দেবে না। কিন্তু তখন স্বল্প সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক ও লিমাস্থ হোটেলসমূহে তার পূর্বনির্ধারিত রিজার্ভেশন বাতিল করা সহজ হবে যদি তিনি লন্ডন যান। সেই মোতাবেক হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১৮ আগস্ট সপত্নীক লন্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮ আগস্ট সোমবার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী অফিস থেকে বাসায় ফেরেন দুপুর বারোটার দিকে। তিনি আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাওয়ার সময় আমাদেরকে কার্লসরুয়ে শহরে পৌঁছেই যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। এর এক ফাঁকে তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতীকস্বরূপ তিনি হাসিনাকে এক হাজার জার্মান মুদ্রা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের তার সাধ্যমতো টাকাপয়সাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। অতঃপর কার্লসরুয়ের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে

> একটি লম্বা সোফায় হাসিনাকে বসানো হয় আর আমাকে আরেকটি লম্বা সোফায়। এর প্রায় মিনিট দশেক পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওই কক্ষে প্রবেশ করে হাসিনার পাশে বসেন। সামান্য কুশলাদি বিনিময়ের পর ইন্দিরা গান্ধী আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, আমরা ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছি কি না

ঘরের বাইরে এসে দেখি যে, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী তার সরকারি রাষ্ট্রদূতের গাড়িটি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাকে এও বলেন যে, কার্লসরুয়ে আমাদের জরুরি কাজগুলো সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন ওই গাড়িটিকে সেখানে রেখে দিই। তার এই সহমর্মিতায় ও মহানুভবতায় আমি আবেগে এতই অভিভূত হয়ে যাই যে, তখন আমার দুচোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। এর জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য কোনো ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমি হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

১৮ আগস্ট বন থেকে ৩৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ করে আমরা নিরাপদে কার্লসরুয়ে পৌঁছাই সন্ধ্যা ৭টার দিকে। আমাদের কার্লসরুয়ে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে আসে কার্লসরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য তখন গবেষণারত শহীদ হোসেন এবং কার্লসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী আমিরুল ইসলাম। অতঃপর হাসিনাদের গেস্টহাউজে রেখে আমি শহীদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কার্লসরুয়েতে উপস্থিতির কথা রিপোর্ট করার জন্য যাই সেখানকার বিশেষ নিরাপত্তাবিষয়ক দপ্তরে। ১৯ আগস্ট আমি কার্লসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসি এবং অন্যান্য জরুরি কাজকর্ম

সম্পন্ন করি ওই গাড়িটি ব্যবহার করে। ২০ আগস্ট আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের ওই গাড়িটি ফেরত পাঠিয়ে দিই। শোক ও শঙ্কায় তখন আমরা এত মুহ্যমান হয়ে পড়ি যে, আমাদের দেখাশোনার ভার নিতে হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামকে। গেস্টহাউজে আমাদের কক্ষ দুটির পাশের কক্ষটি ভাড়া নেওয়া হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামের জন্য। ২২ আগস্ট বন থেকে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে ফোন করে ওদের (ভারতীয় দূতাবাসের) কেউ আমার সঙ্গে কার্লসরুয়েতে যোগাযোগ করেছেন কি না, সে সম্পর্কে জেনে নেন। ২৩ আগস্ট সকালে বনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে ফোনে জানান যে, সেদিনই তার অফিসের একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি কার্লসরুয়েতে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বিকেল ২টায় ওই কর্মকর্তা ওই গেস্টহাউজে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি আমাকে এও জানান যে, তিনি পরদিন অর্থাৎ ২৪ আগস্ট সকাল ৯টার দিকে আমাদের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে নিয়ে যাবেন। পরদিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ভদ্রলোক ওই গেস্টহাউজে পৌঁছান। অতঃপর মালপত্রসহ দুটো ট্যাক্সিতে আমরা কার্লসরুয়ে রেলওয়ে স্টেশনে যাই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে যাওয়ার জন্য। নিজেকে নিরাপত্তার জন্য আমি শহীদ হোসেনকেও সঙ্গে নিই। বিমানবন্দরে বহির্গমন হলে প্রবেশ করার মুহূর্তে শহীদ হোসেনের কাছ হতে বিদায় নেওয়ার সময় তাকে শুধু আকার-ইঙ্গিতে জানাই যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। উল্লেখ্য, ভারতীয় ৯ কর্মকর্তা আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ওই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন রাখার জন্য। শহীদ হোসেনও তখন মুখে কিছু বললেন না। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে তাকাল। তখন আমাদের জন্য সহমর্মিতা ও সমবেদনায় তার দুচোখ ছিল অশ্রুতে ভরা। আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি জাম্বো বিমানে (পশ্চিম) জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিস্থ পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করি ২৫ আগস্ট সকাল ৮টার দিকে। 'আগমন হলে' কাউকেও দেখলাম না আমাদের খোঁজ করতে। দেখতে দেখতে ওই বিমানে আগত প্রায় যাত্রীই চলে যান। মেরামত ও নবরূপায়ণ কাজের জন্য ওই হলটির শীতলীকরণ সিস্টেম বন্ধ ছিল। নানা দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা এবং আগস্ট মাসের প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার কারণে তখন আমার শরীর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছিল। যা হোক, সেখানের এক কর্মকর্তার অফিস থেকে ফোনে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম পৌনে এক ঘণ্টা ধরে। কিন্তু কাউকে পেলাম না। ফলে আমার দুশ্চিন্তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ওই অফিস থেকে হলঘরে এসে হাসিনাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ি। যা হোক, এর একটু পরেই একজন শিখ কর্মকর্তা পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আরও কাছ থেকে জানতে চান যে, আমি ওই দুই মহিলার সহযাত্রী কি না। আমি তাদের সফরসঙ্গী জেনে কর্মকর্তাটি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ওই যুবতী মহিলাদ্বয়কে ওই দুই বাচ্চাসহ ভিআইপি হিসাবে এই বিমানবন্দর হয়ে যেতে দেখেছিলাম। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস যে, আজকে তাদের কী নিদারুণ করুণ অবস্থা। এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

প্রায় আধঘণ্টা পর ওই শিখ কর্মকর্তাটি আমাকে জানান যে, কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অতি শিগগির সেখানে পৌঁছবেন আমাদের ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। এরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দুইজন কর্মকর্তা এলেন আমাদের খোঁজে। তাঁদের একজন নিজেকে ভারত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব বলে পরিচয় দিলেন। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর ওই দুই কর্মকর্তা আমাদের দুটো ট্যাক্সিতে বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসায় নিয়ে যান। তখন ভারতীয় সময় দুপুর ১টা। সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা বিমানবন্দরে অপেক্ষা, দিল্লির প্রচণ্ড আবহাওয়া, পারিবারিক শোক, নিজেদের নিরাপত্তা এবং নানান দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আমি তখন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে দারুণভাবে বিপর্যস্ত।

ডিফেন্স কলোনির বাড়িটির নিচতলার ডাইনিং-কাম-ড্রইংরুম এবং প্রত্যেকটি বাথরুমসহ দুটো শয়নকক্ষ। এর ছাদে সংযুক্ত বাথরুমসহ একটি শয়নকক্ষ, যা তখন গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হতো। দুপুরের খাবার ও বিকেলের চা-নাশতা খাওয়ার পর ওই দুই কর্মকর্তা চলে যান। ওই বাড়ির জানালায় কোনো গ্রিল ছিল না। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই, রাতে রেহানাসহ সবাই মিলে একই শয়নকক্ষে থাকার। পরদিন অর্থাৎ ২৬ আগস্ট ওই কর্মকর্তাদ্বয় ওই বাসায় আসেন আমাদের খবরাখবর জানার জন্য। তারা আমাকে পরামর্শ দেন সবকিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক জার্মানির আমার ওই স্কলারশিপটি কয়েক মাসের জন্য সংরক্ষিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে। অতঃপর ২৭ আগস্ট আমি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ওই মর্মে পত্র পাঠাই।

ওই বাড়ির চত্বরের বাইরে না যাওয়া, সেখানকার কারও নিকট আমাদের পরিচয় না দেওয়া কিংবা দিল্লির কারও সঙ্গে যোগাযোগ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আমাদের সকলকে। অতএব নিঃসঙ্গ অবস্থায় ওই বাড়ির অতি ক্ষুদ্র চত্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি আমরা সকলেই। আমি রাতে শুয়ে সারাক্ষণ জেগে থাকতাম একরকম নিরাপত্তা প্রহরীর মতো। মাঝেমধ্যে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকাতাম। রাতে কয়েক ঘণ্টা পরপর গেটে প্রহরারত দারোয়ানের সঙ্গে বাইরের লোকের ফিসফিস কথা বলা সন্দেহের উদ্রেক করত। এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, মাঝেমধ্যে হাসিনাকে সজাগ করতাম। সারা ভারতে তখন জরুরি অবস্থা আইন বলবৎ ছিল। সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংবাদ প্রকাশিত হতো না। কাজেই তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এভাবেই অতিবাহিত হয় সপ্তাহ দুয়েক। ইতোমধ্যে রেহানাসহ বাচ্চারা চক্ষুপীড়ায় (কনজাংটিভাইটিসে) আক্রান্ত হয়। এমন সময়ে একদিন ভারত সরকারের ওই যুগ্মসচিব হাসিনা ও আমাকে জানান যে, ওই রাতে ৮টায় আমাদের দুজনকে অন্য এক বাসায় নেওয়া হবে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য। সে রাতে সেই বাসায় যাওয়ার পথে অপর একটি গাড়িতে আমাদের সঙ্গে যান একজন অতি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। সেখান থেকে মিনিট পনেরো জার্নি করার পর আমরা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে পৌঁছাই। অতঃপর অতি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ওই কর্মকর্তা আমাদের দুজনকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের একটি মাঝারি ধরনের বৈঠকখানায় নিয়ে যান। একটি লম্বা সোফায় হাসিনাকে বসানো হয় আর আমাকে আরেকটি লম্বা সোফায়। এর প্রায় মিনিট দশেক পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওই কক্ষে প্রবেশ করে হাসিনার পাশে বসেন। সামান্য কুশলাদি বিনিময়ের পর ইন্দিরা গান্ধী আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, আমরা ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছি কি না। এর জবাবে আমাদের জার্মানির বনে থাকাকালীন সময়ে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী আমাকে 'রয়টার' পরিবেশিত এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত যে দুটো ভাষ্যের কথা বলেছিলেন, আমি তার পুনরুল্লেখ করি। অতঃপর ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত ওই কর্মকর্তাকে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য জানাতে বলেন। তখন ওই কর্মকর্তা দুঃখভারাক্রান্ত মনে

ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। এই সংবাদে হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধী তখন হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টায় বলেন, তুমি যা হারিয়েছ তা আর কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না। তোমার একটি শিশু ছেলে ও মেয়ে আছে। এখন থেকে তোমার ছেলেকেই তোমার আব্বা ও মেয়েকে মা হিসাবে ভাবতে হবে। এছাড়াও তোমার ছোটো বোন ও তোমার স্বামী রয়েছে তোমার সঙ্গে। এখন তোমার ছেলে-মেয়ে ও বোনকে মানুষ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অতএব এখন তোমার কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়লে চলবে না। উল্লেখ্য, ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এটাই ছিল আমাদের একমাত্র সাক্ষাৎ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ওই সাক্ষাতের তিন-চারদিন পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নয়াদিল্লিস্থ ভারতের স্বাধীনতায় যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ 'ইন্ডিয়া-গেট'-এর নিকটবর্তী পান্ডারা রোডস্থ প্রতি তলায় দুটি ফ্ল্যাটের একটি সরকারি দোতলা বাড়ির উপরতলার একটি ফ্ল্যাট আমাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। ফ্ল্যাটগুলোয় দুটি করে শয়নকক্ষ। এ ফ্ল্যাটটিতে তখন কোনো আসবাবপত্র ছিল না। যা হোক, আস্তে আস্তে বাজার থেকে ভাড়ায় কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। অতঃপর ১ অক্টোবর সাময়িক ও দৈনিক ভিত্তিতে ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে আমার জন্য একটি পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের বন্দোবস্ত করা হয়। ওই ফেলোশিপের শর্তানুসারে বাসা ও অফিসে যাতায়াতের সুবিধাদির অতিরিক্ত আমাকে দৈনিক প্রদান করা হতো বাষট্টি রুপি পঞ্চাশ পয়সা (ভারতীয় মুদ্রা) মাত্র। ওই বাসাতেও আমাদের একই নিয়ম পালন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাইরের কারও কাছে আমাদের পরিচয় না দেওয়া, কারও সঙ্গে কোনোরূপ যোগাযোগ না করা এবং নিরাপত্তা প্রহরী ব্যতিরেকে বাইরে না যাওয়া আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব বলে আমাদের সবাইকে স্মরণ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। সময় কাটানো ও নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য আমাদের বাসায় সরবরাহ করা হয় একটি ভারতীয় 'সাদা-কালো' টেলিভিশন। এছাড়া আমার একটি নিজস্ব ট্রানজিস্টারও ছিল। ওই বাসায় কোনো টেলিফোন সরবরাহ করা হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশ সম্পর্কে খবরাখবর রাখার আমাদের একমাত্র উপায় ছিল আমার ওই ব্যক্তিগত ট্রানজিস্টার।

লেখক: খ্যাতনামা পরমাণু ও পদার্থবিজ্ঞানী। একজন স্বনামধন্য লেখক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জামাতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী। তাঁর জন্ম ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। ২০০৯ সালের ৯ মে তিনি ইন্তেকাল করেন

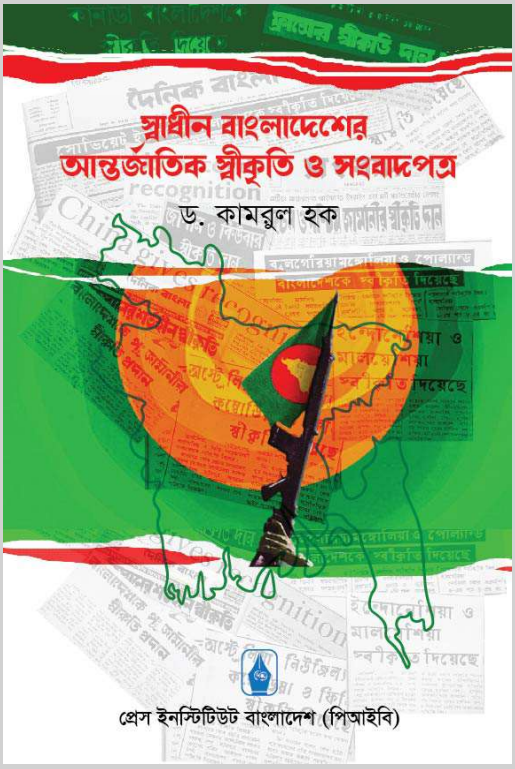

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

পনেরো আগস্ট: ষড়যন্ত্রের পটভূমি বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং আমাদের করণীয়

আবুল মাল আবদুল মুহিত

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট হলো সবচেয়ে কলঙ্কিত দিবস। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের জন্য এটি সত্যিকার অর্থে শোকদিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর নিকটাত্মীয় ও সহযোগী নিয়ে আঠারো জন এই কলঙ্কিত দিনে শাহাদতবরণ করেন। কতিপয় কাপুরুষ দেশদ্রোহী সেনা সদস্য রাতের অন্ধকারে ছলনার আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। শুধু খুনই কিন্তু এই কাপুরুষতার উদ্দেশ্য ছিল না, আর আসল উদ্দেশ্য এখন আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমাদের বহু সাধনা ও সংগ্রামে অর্জিত জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি চুরমার করে দেওয়া ছিল এই হঠকারী অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য। আজকের দিনে আমি শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সঙ্গে যারা শাহাদতবরণ করেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এই আলোচনা শুরু করছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর। ২৬ মার্চ আমরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করি। কারণ সেই দিন শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্ব–আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ। যে যেখানে যেভাবে পেরেছে, যার যা কিছু শক্তি ছিল তাই নিয়ে শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের নগরে, শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে সর্বত্র। এই রকম জনযুদ্ধের নজির আর আছে বলে আমার জানা নেই, সমাজের প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি মতের, প্রতিটি পেশার জনগণের এমন সম্পৃক্ততা আর কোনো মুক্তিযুদ্ধে হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৬ ডিসেম্বর নয় মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে পরাজিত পাকিস্তানি দখলদার দস্যুদলের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে এই দস্যুদল ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) আত্মসমর্পণ করে রক্ষা পায় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হয় মুক্ত। এই দিনটি আমরা বিজয় দিবস হিসাবে পালন করি। ষড়যন্ত্রকারী আন্তঃশত্রু ও কোনো বহিঃশক্তির প্ররোচনা এই দুইটি বাস্তবতাকে এখনো বিকৃত করতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধ রাতারাতি হয়ে যায়নি এবং বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠা পায়নি। এর পেছনে আছে এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় একটি জাতির উদ্ভবের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই প্রক্রিয়ার শুরু হয় যখন বাংলা ভাষার হয় আত্মপ্রকাশ। এই প্রক্রিয়ার শুরু হয় মাৎস্যন্যায়ের পঞ্চাশ বছরের নৈরাজ্যের শেষে যখন ছোটো ছোটো রাজন্যরা সংঘবদ্ধ হয়ে একজন নৃপতি নির্বাচন করেন। বৌদ্ধ পাল রাজবংশ (৭৫০-১১৫৫), হিন্দু সেন রাজবংশ (১১১৮-১২০৬), মুসলিম দাস ও খিলজী রাজত্ব (১২০৩-১৩৪২) এই জাতিকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। তবে ১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত বাংলায় সুলতানি রাজত্ব আমলে এবং পরবর্তী সময়ে মোগল সুবেদারদের আমলে (১৬১২-১৬৫৭) বাংলায় একটি স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তার বিকাশ ঘটে।

১৭৫৭ সালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কার্যত বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের শুরু হয়। ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাটের ফরমানে এই শাসন বল সঞ্চয় করে। পরবর্তী ৯৩ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তা সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়। ১৮৫৭ সালে এই বিদেশি শাসন উৎখাতের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে কোম্পানি শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশ আমলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় একটি ভাষাভিত্তিক জাতিগঠন প্রক্রিয় সংহত হওয়ার সুযোগ পায়। তবে বৃহত্তর ভারতে তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসান আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগে। সারা ভারতে সর্বভারতীয় স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের এই উত্তাল সময়ে বাংলায় জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বেশ বিঘ্নিত হয়। একটি সুযোগ আবার আসে ভারতবিভাগের সময়। যুক্ত বাংলায় একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উদ্যোগ কিন্তু ব্যর্থ হয়। সর্বভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই উদ্যোগকে সমর্থন করলেও কংগ্রেসের মূলধারা ও ব্রিটিশ ভাইসরয়ের আপত্তিতে হাজার বছরের বাংলা জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীতে উসকে ওঠা সাম্প্রদায়িকতাও এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

অতঃপর পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। পাকিস্তানের স্বার্থপর শোষণ নীতি, পাক সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল ও চণ্ড নীতি, বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক বঞ্চনা, পাকিস্তানে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ–সবকিছু মিলে আবার তাতিয়ে দেয় বাংলার জাতিরাষ্ট্র গঠনের সুপ্ত স্বপ্ন। এই জাতির শুধু একটি ভাষাই ছিল না। সমাজজীবনে এই জাতি ছিল একটি যৌগিক গোষ্ঠী, শুধু সংশ্লেষী নয়। ধর্মকর্মে সহনশীলতা, আত্মার আচরণে সমমাত্রিক কৃষ্টি, অর্থনৈতিক জীবনে সমতার আকাঙ্ক্ষা ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি এই জাতিকে করে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত। পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ও সামরিক ঐতিহ্যে পূর্ববাংলার এই চেতনার জন্য কোনো সুযোগ ছিল না। তাই তেইশ বছরের সম্পর্ক ও সংগ্রাম অবশেষে ব্যর্থ হলো। মুক্তিযুদ্ধ হলো গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সামরিক কর্তৃত্বকে বিদায় দিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মান্ধতাকে বিতাড়ন করে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। বঞ্চনা ও শোষণকে খতম করে সবার জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ ও ন্যূনতম সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশ্বরাজনৈতিক কৌশল পরিহার করে মানবাধিকারকে সমুন্নত করার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে উপরিউক্ত আদর্শবাদ ও স্বপ্ন যত শক্তিশালী ছিল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তা হয় আরও সুদৃঢ়। মুক্তিযুদ্ধে এসব আদর্শ বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য জনযুদ্ধে ধর্ম দিয়ে কোনো মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় ছিল না। এই জনযুদ্ধে সব পেশার, সব স্তরের, সব মানসিকতার জনগণ ছিল একসূত্রে গ্রথিত, এক পরিচয়ে পরিচিত ও এক উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ। এই দৃঢ়চিত্ত উদ্যোগ, এই নিখাদ ঐক্য এবং এই পবিত্র আদর্শবাদ একদিকে যেমন বিশ্বজনমতের সমর্থন লাভ করে, অন্যদিকে তেমনই ক্ষমতাশালী স্বার্থগোষ্ঠীকে ঘোর শত্রুতে পরিণত করে।

পাকিস্তান তো ছিল সরাসরি শত্রুপক্ষ। তারা ধর্মের নামে চালায় তাণ্ডব এবং ধর্মের নামে সমর্থন আদায় করে মুসলিমবিশ্বের। তারা সার্বভৌমত্বের নামে গণহত্যা সাধন করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায় বাংলাদেশে। তারা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার অজুহাতে চালায় মানবাধিকারের নৃশংস দলন। বাংলাদেশের জাগ্রত জনতাকে তারা অপমানিত করে ভারতের দালাল বলে। তাদের বিবেচনার বাংলার সমুদয় সমর্থক যুবক হয়ে যায় দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশকে পদানত করার এই কৌশল তারা পরিহার করেছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের ইতিহাসে এখনো বলা হয় যে ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। আজও সরকারিভাবে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তারা পাকিস্তানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করে, সেখানে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের একটি প্রদেশ হিসাবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তানের একজন ফেডারেল মন্ত্রী আজও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ বলে মনে করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। মুক্তিযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভূরাজনৈতিক কৌশলের কারণে পাকিস্তানের নৃশংসতার কোনো নিন্দাবাদ করেনি এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ছলেবলে কৌশলে সাহায্য অব্যাহত রাখে। যদিও মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সংবাদমাধ্যম বা মার্কিন শিক্ষা মহল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে কিন্তু মার্কিন নির্বাহী বিভাগ বিশেষ করে নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি ছিলেন বাংলাদেশের বিজয়ের ঘোর বিরোধী। অনেক মার্কিন গবেষকের মতে, বাংলাদেশের বিজয় কিসিঞ্জারকে এতই ক্ষুব্ধ করে যে বাংলাদেশের স্থপতি তার ভয়ানক শত্রুতে পরিণত হন। বাংলাদেশের বিজয়কে এই জুটি তাদের পরাজয় ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করে। বাংলাদেশে যখন সামরিক হঠকারিতা সফল হয়, তখন নিক্সন অবশ্যই ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত, কিন্তু কিসিঞ্জার তখনও সদর্পে বিদ্যমান।

মুসলিমবিশ্বে বাংলাদেশ আস্তে আস্তে গৃহীত হলেও কতিপয় গোঁড়াগোষ্ঠী বাংলাদেশকে মানতে রাজি ছিল না। সৌদি আরব তো শর্ত দিয়ে বসল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে। লিবিয়া সেই সময়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত এবং নানা দেশে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকানি দিতে অভ্যস্ত। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও ১৯৭২ সালের পর (নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগের পর) বাংলাদেশকে শত্রু বিবেচনা করত না, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব খর্ব করতে প্রস্তুত ছিল না।

বহির্বিশ্বে যখন এই অবস্থা, তখন দেশের অভ্যন্তরে পরাজিত শক্তি সংহত হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এসব দেশ শত্রু, বিশেষ করে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী দল দুটি গুহায় আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে যখন বিরোধী দলের বিকাশ হতে থাকল, এসব অন্ধকারের জীবগুলো এই নতুন দলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। আমার মতে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আবির্ভাব অশুভ ছিল না এবং এর পুরোধায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এক গোষ্ঠী। কিন্তু তাদেরকে বেজন্মা রাজাকাররা একটি মঞ্চ হিসাবে পায় এবং এর ছত্রছায়ায় তাদের নিজস্ব ধারায় দুষ্কর্ম করে চলে।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গড়ে উঠে এক অনন্য ধারায়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তা ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক। সেনাবাহিনী, আধা-সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিয়ে তাদের সম্মিলিত শক্তি বারো হাজার সৈনিক ও দুইশ কর্মকর্তার কম ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই

তারা রাজনৈতিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এই সেনাবাহিনীতে আত্মস্থ হলেন আরও বাঙালি সৈনিক ও কর্মকর্তা, যারা কারণে-অকারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। সেখানেই শুরু হয় প্রাথমিক জটিলতা ও শৃঙ্খলার সমস্যা। পাকিস্তান থেকে যখন বাঙালি সেনা সদস্যরা প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন বিষয়টি আরও জটিল হয়ে গেলে। এরাই হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ এবং এদের চিন্তাচেতনায় মুক্তিযুদ্ধের উচ্চাদর্শ তেমন অর্থবহ ছিল না।

এই পটভূমিতে সংঘটিত হয় পনেরো আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান ও কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা এর পরিকল্পনা করেন এবং একে বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র করেন। তারা আসলেই বাংলাদেশের আদর্শের বিরোধী এবং একসময়ে তারা তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে। যদিও কাপুরুষের মতো বিচারের কাঠগড়ায় এসব বক্তব্য বেমালুম অস্বীকার করে বসেন। এই ষড়যন্ত্রটি হয় পাকিস্তানের সঙ্গে ও পাকিস্তানের মদতে। ষড়যন্ত্রকারীরা অন্যত্র সহযোগী খোঁজে, তাই তাদের পরিকল্পনা অনেকেরই জানা ছিল। এরা সহযোগী না হলেও সাফল্যের পর তাদের সমর্থন করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ তারা চায় এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সেই সমর্থন তারা কোনো কোনো পক্ষ থেকে সরাসরি না পেলেও নিশ্চিত হয়। তাদের পরিকল্পনা উপসেনাপ্রধানের জানা ছিল। তারা মার্কিন দূতাবাসেও ধরনা দেয়। তাদের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কতিপয় মীরজাফরের পৃষ্ঠপোষকতা তারা লাভ করে। তারা প্রতারণার আশ্রয়ে হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এক গোষ্ঠীকে এতে সম্পৃক্ত করে সারা জাতিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। আমার মনে হয় পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোনো বহিঃশক্তি এদের নীলনকশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের মাধ্যমে লিবিয়া হয়তো অর্থসাহায্য দিয়েছিল। তবে ষড়যন্ত্রকারীরা সাফল্য লাভ করলে তাদের দিকে সহায়তার হাত অনেকেই বাড়িয়ে দেয়। যেমন মার্কিন উদ্যোগে কতিপয় হত্যাকারী থাইল্যান্ডে পালাতে পারে। আবার লিবিয়ায় কতিপয় হত্যাকারী আশ্রয় ও অর্থ সাহায্য পায়। লক্ষ করার বিষয় হলো যে খুনি ডালিমের বেতার ঘোষণায় প্রথম বিদেশি অনুরণন হয় পাকিস্তান থেকে এবং পাকিস্তানের ঘোষণায় বাংলাদেশের ইসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। কতিপয় হঠকারী সেনা কর্মকর্তার এই অভ্যুত্থানের বিষয়টি অনেকের জানা ছিল; কিন্তু তা প্রতিরোধের জন্য কেউ কোনো ভূমিকা নেয়নি। ষড়যন্ত্রটি মূলত শুধু জাতির পিতাকে হত্যা করার জন্য ছিল না, ছিল মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে বিনাশের জন্য। যে আদর্শ মুক্তিযুদ্ধে সমুন্নত হয় তার শত্রুতার কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। এই আদর্শগুলোকে চুরমার করে দেওয়ার ব্রত নিয়ে হয় এই সামরিক অভ্যুত্থান। এবং এই অভ্যুত্থানের প্রধান ভোগকারী তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনকালে সারাটি জাতির চরিত্রহনন ও মূল্যবোধ ধ্বংসের কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন।

* জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথমেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা হরণ করলেন। নির্বাচনে জালিয়াতি আগেও হতো তবে প্রশাসনকে দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া ধ্বংস শুরু করেন তিনি। ১৯৭৭-এর মে মাসে তিনি গণভোটের ব্যবস্থা করলেন, তাতে প্রদত্ত ভোট ছিল অবিশ্বাস্য–৮৫ শতাংশ এবং হ্যাঁ ভোট ছিল ৯৮.৯ শতাংশ। প্রশাসনকে নির্বাচনি ফলাফল নির্ধারণে পারদর্শী করেন দুই সামরিক শাসক।
* জেনারেল জিয়া সংবিধানের চরিত্র বদল করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ধর্মকে রাজনীতিতে সমাসীন করেন। তার হুকুমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠা পেল।
* তার রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া ছিল সরকারি গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্যে ঘুস ও সন্ত্রাস দিয়ে দল গঠন, দল ভাঙন ও রাজনীতিবিদদের বেচাকেনার ব্যাবসা পরিচালনা।
* তিনি নিজস্ব উদ্যোগে ছাত্ররাজনীতিতে দলীয় প্রভাব নিশ্চিত করেন এবং ছাত্রমহলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এক যুবককে জেল থেকে বের করে এই সন্ত্রাসী উদ্যোগের সূচনা হয়। ছাত্রমহলে সন্ত্রাস আগেই শুরু হয় তবে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন জেনারেল জিয়া।
* আইনের শাসন প্রতিহত করতে তিনি কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইনকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেন। সর্বোচ্চ অপরাধের জন্য দুষ্কৃতকারীরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এই খুনিদের আবার তিনি সরকারি পদে বহাল করেন ও কূটনৈতিক দায়িত্ব দেন।
* তার অন্যতম অবদান ছিল রাজাকার ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন। যোগসাজশ আইন বাতিল করে তিনি রাজাকারদের রাজনীতি করার সুযোগ দেন এবং খুনি, ধর্ষক, লুণ্ঠনকারী ও বোমাবাজদের অপরাধ মাফ করে দেন। দেশত্যাগী রাজাকার দেশে ফিরল, ক্ষমাপ্রাপ্ত রাজাকার দেশের প্রধানমন্ত্রী হলো।
* আইয়ুবি কায়দায় তিনি দেশে সাংবিধানিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ প্রত্যাহার করেন।

> দেশের অভ্যন্তরে পরাজিত শক্তি সংহত হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এসব দেশ শত্রু, বিশেষ করে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী দল দুটি গুহায় আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে যখন বিরোধী দলের বিকাশ হতে থাকল, এসব অন্ধকারের জীবগুলো এই নতুন দলে আশ্রয় নিতে শুরু করে

* তিনি বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে এক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।
* সর্বোপরি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন শুরু করে তিনি রাজনীতিতে শিক্ষিত যুবসমাজের অনীহা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশে নেতৃত্বের দুর্ভিক্ষের জন্ম দেন।

এভাবে পনেরো আগস্টের নৃশংস অভ্যুত্থান শুধু বাংলাদেশে সামরিক শাসনই বহাল করল না বরং এই জাতিরাষ্ট্রের মজ্জাগত আদর্শকে ধ্বংস করে পাকিস্তানের প্রেতাত্মাকে স্বাগত জানায়। দীর্ঘ ষোলো বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসন আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের বিকাশ এবং দ্রুত আর্থসামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়। এই অভিশাপ জাতি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পচন প্রক্রিয়া এত বলিষ্ঠ যে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্বাচনে জালিয়াতি এখন আমাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রায়িত ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতায়নকে বিতাড়ন করেছে। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় দায়িত্ব বলে কিছু রাষ্ট্রে দেখা যায় না। সমঝোতার পরিবর্তে বিভক্তি আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবেই সোনার বাংলার অস্তিত্বই এখন প্রশ্নাধীন। রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় না। সরকার ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি জাতিকে বহন করতে হয়। দেশে মৌলবাদী সন্ত্রাস ব্যাপক। লুটপাট এবং চুরি রাজনীতিবিদদের পেশা। প্রশাসন রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিবাজ ও রাজনৈতিক দলবাজিতে পরিপক্ব। প্রতিটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান অবক্ষয়ের মুখোমুখি। পুলিশ যেন এক দুর্বৃত্ত বাহিনী। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস ও দুর্নীতির আখড়া। বিচার বিভাগ দুর্নীতিপরায়ণ এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষতার তোয়াক্কা করে না। প্রায় সব পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। এই বিষময় বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের জন্য যদি সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ না নেওয়া যায়, তাহলে গৃহযুদ্ধ এবং মহাপ্রলয় তার সমাধান খুঁজে পাবে।

সক্রিয় উদ্যোগের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বিবেচনা করা যায়:

১. প্রথমেই সন্ত্রাস উৎপাটনের জন্য সব সন্ত্রাস পরিহার করতে হবে। সন্ত্রাসে সন্ত্রাস দমন হয় না। সন্ত্রাস মূলত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত হয়। এই পৃষ্ঠপোষকতা পরিহারের জন্য রাজনৈতিক দলকে যেমন বিশুদ্ধ আন্দোলন করাতে হবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকেও তেমনই ঢেলে সাজাতে হবে। স্থানীয়ভাবে দায়বদ্ধ পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন। গণনিপীড়নের পরিবর্তে জনসেবার আদর্শে তাদের পুনর্গঠন করতে হবে।
২. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গড়তে হবে। ভোট জালিয়াতি রোধের সহজ প্রতিষেধক বের করতে হবে, যেমন বুথপ্রতি সর্বোচ্চ ভোটের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৫/৭ দিনব্যাপী ভোট অনুষ্ঠান করতে হবে।
৩. রাষ্ট্রপতিব্যবস্থায় গড়ে ওঠা সচিবালয়কে ভেঙে সাজাতে হবে। সংসদীয় কায়দায় মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদে রাষ্ট্রীয় সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে হবে। সংসদের কার্যপরিচালনায় নতুন নিয়মে বিরোধী দলের আওয়াজ ও ভূমিকাকে জোরদার করতে হবে। যেমন, প্রতি অধিবেশনে বিরোধী দলের প্রশ্ন, মুলতুবি প্রস্তাব ইত্যাদি উত্থাপনের নির্দিষ্ট সুযোগ দিতে হবে।
৪. ক্ষমতার প্রতিসংক্রম করে জনগণের ক্ষমতায়নকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড স্থানীয় পর্যায়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে লম্বা দাগে সংকোচন করতে হবে। আমলাগোষ্ঠীর দলীয়করণের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।
৫. রাজনৈতিক দলের শক্তি হলো তৃণমূল পর্যায়ে। তাই তৃণমূলে সংগঠন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে জনগণের বৃহত্তম দল হিসাবে আওয়ামী লীগের যা সুযোগ রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চা সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। সহনশীলতা ও সমঝোতার কৃষ্টিকে সমুন্নত করতে হবে।
৬. সাম্প্রদায়িকতার উৎপাটনে ধর্মকে রাষ্ট্রকর্ম থেকে আলাদা করতে হবে। অত্যন্ত সচেতনভাবে মৌলবাদের অভ্যুত্থান কঠোর হাতে প্রতিরোধ করতে হবে।
৭. রাষ্ট্রীয় সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দলবাজি থেকে রেহাই দিতে হবে। বিচার বিভাগের পৃথককরণ, পুলিশবাহিনীর বিকেন্দ্রীকরণ ও পুনর্গঠন, শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধারার সব শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুসংগঠনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৮. দুর্নীতি বিতাড়নের জন্য একদিকে সামাজিক আন্দোলন হবে, অন্যদিকে একটি সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মকাণ্ড সংকোচন করে, সরকারি দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে, সরকারি সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে এবং দায়বদ্ধতার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং তা নিরপেক্ষভাবে প্রদানের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে নিতে হবে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উচ্চপর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।
৯. গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে নজর দিতে হবে। একটি সমন্বিত সঠিক বিনিয়োগ নীতিমালা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করতে হবে।
১০. সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সমাজজীবনে যৌগিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক জীবনে সুযোগের সৃষ্টি ও ন্যূনতম সমতা প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির প্রসার এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য যেসব গোষ্ঠী, দল ও সংগঠনের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের প্রয়োজন।

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট বস্তুতই বাংলাদেশের অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জ করে বসে। এই দিনের অভ্যুত্থান ছিল একটি সুপরিকল্পিত প্রতিবিপ্লব, পরাজিত শক্তির উত্থানের প্রথম পদক্ষেপ। বাংলাদেশ যে আদর্শের প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নে আন্দোলিত, তারই প্রত্যাখ্যান ছিল এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য। আজ তিরিশ বছরের মাথায় সেই হুমকিটি ভয়ংকর আকারে প্রতিভাত হচ্ছে। তবে শত বাধাবিপত্তি ও অত্যাচার-নির্যাতনও এই জাতিরাষ্ট্রের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা এবং তার মজ্জাগত মূল্যবোধকে এখনো উৎখাত করতে পারেনি। তবে এবার আঘাতটিকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত কার্যক্রম এবং বৃহত্তর ঐক্য। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন আমরা ব্যর্থ হতে দিব না–জাতির পিতার শাহাদত দিবসে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং সাহসী উচ্চারণ।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, ভাষাসৈনিক ও রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কূটনীতিক হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ নেন। ১৯৩৪ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণকারী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০২২ সালের ৩০ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

কালো দিঘল রাত এখনো পোহায়নি

অধ্যাপক সামছুল হুদা হারুন

'বঙ্গবন্ধু' একটি অতুলনীয় উচ্চারণ, একটি বিস্তৃত গভীর উপাধি, অবহেলিত জনগণের মুক্তি প্রতিষ্ঠার অবিস্মরণীয় এক অবলম্বন। তাঁকে হত্যা করে ঘাতকরা একটি জাতিকে দিশেহারা করল, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করল, আমাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের পথে ঠেলে দিল। গান্ধীজিকে হত্যার পর জওহরলাল নেহরু বিষণ্নচিত্তে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, 'A light has gone out of us', 'বাপুজি মেয় কেয়া করু', ঠিক তেমনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের অনুভূতিতে প্রবল এক ধাক্কা এসেছে, ধিক্কার জন্মেছে। একই সঙ্গে আমরা আলোহীন হলাম, আমাদের সংবিধান কলুষিত হলো, মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত রাষ্ট্রীয় ভাবনাগুলোয় হস্তক্ষেপ হলো অযাচিতভাবে। তিনি অপরিহার্য ছিলেন বাঙালির জন্য, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য, আমাদের ভূখণ্ডের মুক্তির জন্য। সেকারণেই পৃথিবীর বহু গণমাধ্যম ১৯৭১-এ মহান বিজয় অর্জনের পরও বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মনে করেছিল অসম্পূর্ণ। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশের মাটিতে পা ফেলার পর বাঙালি বিদ্যুৎ ঝলকানির গতির মতো উদ্যম পেল, ভরসা পেল, স্বাধীনতাকে মনে হলো তাদের বিপুল অর্জন, তাদের প্রাপ্তি ও সাফল্য। তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সব মানুষের ভালোবাসায় বেড়ে ওঠা প্রকৃত দুর্লভ নেতা। সেকারণেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা কোনো সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটি ছিল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, উদ্দেশ্যমূলক প্রতিশোধ এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ বিলীন করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অর্জনকে পুরোমাত্রায় ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্যেই বাঙালি জাতিকে ১৫ আগস্টের কালরাত্রির কলঙ্ক মাথায় নিতে হয়েছে। কতিপয় বিভ্রান্তকারী সামরিক কর্তারা অকস্মাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে–বিষয়টি তা নয়, বরং তা ছিল এর তুলনায় বহুগুণ বেশি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক ও সচেতন থাকার কথা বলা হলেও নিজেকে তাঁর প্রিয় বাংলায় অনিরাপদ ভাবার সংকীর্ণতায় তিনি মুহূর্তের জন্য ভোগেননি। কিন্তু ঘাতকদের অশুভ

পরিকল্পনা থেকে তাঁকে বাঁচানো যায়নি। বলা যায়, 'The saviour of mankind could not save himself.' ঘাতকদের দিনক্ষণ পর্যন্ত ছিল অশুভ। জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করা হয়েছিল ১৫ মার্চ। মার্চ, জুন, আগস্ট, অক্টোবরের ১৫ একটি অশুভ তারিখ কৃষ্ণবিজ্ঞানে (occult science)। বঙ্গবন্ধুর মানবীয় বিপুল বিকাশের মধ্যেই খুব নীরবে তৈরি হয়েছে তাঁর ঘাতকরা। কেননা যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কথা তিনি ভেবেছিলেন, বহু ত্যাগ ও নির্ভেজাল নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা গঠিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা যারা চায়নি তাদের সাম্প্রদায়িক ভাবনার বীজ সুপ্ত বহুকালের গোঁড়ামি, প্রগতিবিমুখিতা এবং ধর্মীয় ভ্রান্তবিশ্বাসের জঙ্গি মনোবৃত্তির ধারাবাহিকতায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিও হয়েছে একই মনোবৃত্তিতে।

পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এর আবিষ্কর্তারা হারানো বা লুপ্ত গৌরব ফিরে পাওয়ার আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। যে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন এ অঞ্চলে ঘটেছিল, ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির মধ্য দিয়ে যেন তার আংশিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল। ধর্মকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা ফিরে পেল পাকিস্তানের শাসকরা। রাজনৈতিক বিবেচনায় এ পদক্ষেপ আধুনিক নয় বরং অনগ্রসরতা ও অবরুদ্ধতার বাস্তব পদক্ষেপ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনিতর রাজনৈতিক মনোবৃত্তি আরও জাগ্রত হয়েছে; কিন্তু তা শুভ ফলদায়ক হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতালিতে ইরেডেন্টিস্ট (Irredentist) মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সিরিয়া, লেবানন ও ইসরাইলসহ আরও কিছু অঞ্চলকে নিয়ে Greater syrian levant গড়ে তুলতে চেয়েছিল। পাকিস্তানও সেরূপ মতবাদেরই আরেকটি প্রকরণ। খাজা নাজিমুদ্দিন নিজেই বলেছিলেন, 'Muslim league claimed to have avenged the downfall of the muslim empire in the subcontinent by achieving Pakistan in 1947' (Nazimuddin, Dawn, Oct. 13, 1952)। মুখ্যত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি অনগ্রসর, কল্যাণবিমুখ, প্রতিশোধমূলক একটি Doctrine-এর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এর কাঠামোগত প্রকাশ ছিল ভিন্নমাত্রিক। এটি যেন একটি রাষ্ট্র নয় বরং ধর্মীয় আবরণে সৃষ্ট ও শাসিত একটি বৈরী শাসনব্যবস্থা। সম্মিলিত কোনো আকাঙ্ক্ষার ফসল এটি ছিল না বরং পাকিস্তান এসেছে অনেকটা অগত্যা রাষ্ট্র হিসাবে। বলা যায়, এটি ছিল একটি anagram state বা শাব্দিক রাষ্ট্র। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেই একবার বলেছিলেন ঘুণে খাওয়া কীটদষ্ট (moth eaten) খণ্ড-বিখণ্ড (mutilated) অবচ্ছেদন করা (truncated) এই পাকিস্তান আমি চাই না। জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট ধারণা ও তার প্রতি প্রবল অনুভূতির বাইরে যখন একটি অকস্মাৎ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তখন তার মধ্যে সাম্য, শৈলী, সৌন্দর্য চরমভাবে নষ্ট হয়, মুষড়ে পড়ে। রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাই ঘটেছে। সব হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে হিন্দুস্তান এবং সব মুসলমানকে সমন্বিত করে পাকিস্তান–এই স্পষ্ট বিভাজনে তখনকার বিভক্তির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়নি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বলেন, 'Today musalmans cease to be musalmans, Hindus cease to be Hindus, not in the religious sense, but in the political sense.' মুখ্যত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রধান উপাদানগুলোর প্রবল অনুপস্থিতি ছিল পাকিস্তানে। ধর্মরাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক উপকরণ হলে মধ্যপ্রাচ্যের সব অঞ্চল সম্মিলিত হয়ে একক রাষ্ট্রে রূপ নিত। বহুকালের প্রবাহেও তা হয়ে ওঠেনি। সে বিবেচনায় পাকিস্তান সৃষ্টি একটি রাজনৈতিক কৌশল ও ভ্রান্তিতে ভরা ঐতিহাসিক অধ্যায়মাত্র। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান শাসনব্যবস্থায় কায়েম করেছে বৈষম্যমূলক নীতি, শোষণ ও নির্যাতন। বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে সেই শোষণের বিরুদ্ধাচরণ করলেন, রুখে দাঁড়ালেন। দাবি জানালেন মুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার। তিনিই প্রথম একটি আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্য একটি 'Sustainable political movement' গড়ে তোলা বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি একটি অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, একটি আঞ্চলিক স্বাধীনতা তথা প্রকৃত মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন alpha to omega প্রক্রিয়ার মধ্যে। নিষ্ঠুর অধ্যবসায়, জেল-জুলুম, নির্যাতন, মৃত্যুর হুমকি, খুঁড়ে রাখা কবরের প্রান্তে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধুই বাংলার স্বাধীনতার কথা বলেছেন, আমাদের মুক্তির কথা বলেছেন। এই নিষ্ঠুর অধ্যবসায় ও একাগ্রতা ঘাতকদের ব্যাকুল করে তুলেছিল, তাই তারা বেছে নিয়েছে সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পথটি–সপরিবারে একজন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে ইতিহাসবেত্তারা শুধু একজন আপসহীন সংগ্রামী তেজোদীপ্ত নেতাকেই খুঁজে পান না, বরং চেতনায় নিপুণভাবে শানিত এমন একজন বিরল মানুষকে আবিষ্কার করেন যিনি দূরদর্শী, সুবিবেচক, কল্যাণকামী, বিশ্বভাবনা তথা ভূ-অঞ্চলভেদে রাজনৈতিক কৃষ্টি ও জীবনবোধ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ধারণ করেন। তাঁর বেড়ে ওঠার মধ্যে ভীষণভাবে গ্রথিত ছিল একটি আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, একটি স্পষ্ট টেকসই রাজনৈতিক ভাবনা, যা আক্ষরিক অর্থেই শোষণহীন এবং মুক্তিভিশারী। বঙ্গবন্ধুর জীবন ছিল অসাধ্য সাধনের রাজনৈতিক ব্রতে নিয়োজিত এক কণ্টকাকীর্ণ পথে বিস্তৃত। তিনি হেঁটে চলেছেন–দীর্ঘপথ, কঠিন-কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। স্কুলপড়ুয়া শেখ মুজিব তেজোদীপ্ত সিদ্ধান্তের নেতৃত্ব দেওয়ায় কারাবরণ করেছেন কৈশোরে। সেই তেজোদীপ্তি, অসীম সাহস ও দেশপ্রেমের অন্তর্গত প্রবল অনুভূতি নিয়ে তিনি ধারাক্রমে একটি রাষ্ট্রের স্রষ্টা হলেন, বাঙালির সুনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের ঠিকানা খুঁজে দিলেন, দিলেন পতাকা, সংবিধান, ভূখণ্ড এবং সার্বভৌমত্ব। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে জন্মের পর তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দেখলেন সাতচল্লিশের ভারত-পাকিস্তান বিভক্তি, মুসলিম লীগের পাকিস্তান শাসন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ, ধর্মকে শাসনের হাতিয়ার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি, উপেক্ষিত গণমানুষের পরাধীন জীবনাচার। বঙ্গবন্ধু আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিবাদ করলেন, গড়ে তুললেন দল, এ অঞ্চলের প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে গেলেন, জ্ঞানতাপসদের ভাবনাকে সমন্বিত করলেন। অতঃপর একটি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অপরিণত কোনো রাষ্ট্র নয় বরং একটি জাতিরাষ্ট্রের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে কায়েম করলেন বিশ্বনন্দিত স্বকীয় প্রবল নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাতে বঙ্গবন্ধু অনুপ্রেরণাবোধ করেছেন, নিজেকে সেই ভাবনাগুলোর সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন; কিন্তু পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন যখন রাজনীতির মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে, তখন তাতে দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব ইত্যাদি উপকরণ যোগ হয়, বঙ্গবন্ধু তাতে স্বস্তিবোধ করেননি। বরং '৪৯ সাল থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত কৌশলগতভাবে এগোতে থাকেন।

বঙ্গবন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে পাকিস্তান শাসনামলে বারংবার কারাগারের প্রকোষ্ঠে থেকে। যেখানেই পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায় হস্তক্ষেপ, সেখানেই বঙ্গবন্ধুর জোরালো প্রতিবাদ, বহুবার তাঁকে ঠেলে দিয়েছে কারাগারের দিকে। তবু তিনি মাথা নোয়াননি কোনোদিন। মুচলেকা দিয়ে

কারাগার থেকে বেরুনোর কথা বঙ্গবন্ধু ভাবতেও পারেননি একমুহূর্তের জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। মুসলিম লীগের কৌশলী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের সংগঠিত করতে থাকেন। '৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম ছাত্রলীগ। আইন পরিষদে খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত শুরু করেন বঙ্গবন্ধু এর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতাকে সজাগ ও একতাবদ্ধ করে তোলার উদ্যোগ নেন, প্রতিবাদ করেন। ১১ মার্চ ধর্মঘট পালন করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। মুক্তি পান '৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে বহিষ্কৃত হন। '৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। জেলে থাকা অবস্থায়ই বঙ্গবন্ধু এ দলের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে বহুবার কারাবরণের পর মুক্তি পেয়ে '৫০ সালের ১ জানুয়ারি ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু পুনরায় গ্রেফতার হন। এবার একটানা তাঁকে দুবছর কারাবরণ করতে হয়। ভাষার দাবিতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯৫৩ সালে ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিব দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে তিনি মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। গণপরিষদে আগস্টের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'We have demanded so many times that you should make it Bengal. The word Bengal has a history...a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulated.... We would like to be called ourselves as Bengali....'

প্রিয় ভূ-অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও ধারাক্রমে মুক্তির বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল যুক্তিপূর্ণ ও ধারাল। তিনি ১৯৫৫ সালে জাতীয় সংসদের বক্তৃতায় বলেন, 'We had given 21 point programme to the people of East Bengal in which we had categorically mentioned that only defence, foreign affairs and currency should remain with the central government and the rest should be transferred to the province.'

বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছেছেন অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে। তিনি পশ্চিমা শাসকদের সময়মতো জানিয়েছেন প্রতিবাদের সঠিক ভাষা। পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বললেন, '... I appeal to my friends, zulm maat koro. If you will force it upon us then we have to adopt unconstitutional means...that is what happened all over the world.' (CAD, Sept. 1955, p. 1007)। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল পূর্ববাংলার স্বাধীনতা অর্জনের স্পষ্ট পূর্বাভাস, মুক্তিযুদ্ধের শক্ত ভিত নির্মাণের এক একটি স্তম্ভ। পাকিস্তানের জাতীয় গণপরিষদে বঙ্গবন্ধুর এরূপ সবল উপস্থিতিকে একজন গ্রন্থকার মনে করেন, 'The Prometheus was unbound in the person of Sheikh Mujibur Rahman, the potential Bangabandhu of the coming days of Bangladesh destiny and apostle of Bengal nationalism. (The Parliamentary behavior in a multi national state, p. 129)।

> পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এদেশের ইতিহাসে দিঘল এক কালরাত্রি। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সজীব প্রাপ্তিগুলো সংবিধানবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সব অগ্রসরতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে। পেছনে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো উন্নয়নের চাকাকে

পশ্চিমা শাসকদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন অগ্নিপুরুষ। সে কারণেই তৎকালীন গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা গোলাম মোহাম্মদের কাছে প্রেরিত একপত্রে তাঁর সম্পর্কে অভিমত করেন, '.... Has been in prison several times. Is a remarkably good organizer. Has gatts. Hold extreme views in politics, is an experienced agitator, May be described as the stormy petrel of Awami league. A dangerous gentlemen who is best in jail.' (Top secret, Do/no. 101/ps. 21st June 1954)।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব সরকার প্রথম সামরিক শাসন জারি করেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পাকিস্তান ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর কাছে জানতে চাওয়া হলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়: '... Took prominent part in 1948 language movement and was arrested in 11.03.48. Again arrested in 19.04.49. criticized BBC report. Took leading part in the language movement to boycott Urdu provincewise. (F/NG 606-48-PF, P. 28)।

গ্রেফতারের রাতে বঙ্গবন্ধু গোপন চিঠি মারফত তাঁর দলের কর্মীদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর কর্মীদের চিঠিতে জানিয়েছিলেন: Martial law is a prelude

to the establishment of punjabi rule in East Pakistan. Bengal language is finished.

East Pakistan would be made a colony of west Pakistan.

East Pakistan is doomed for ever.

(R-438: Criminal Investigation Bureau secret # 244, 11.10.58 F/N 606-48 : PF, P. 28)।

পাকিস্তানি শাসনামলের অনেকটা সময়জুড়ে কারাগারের প্রকোষ্ঠে থাকা বঙ্গবন্ধু কারা কর্তৃপক্ষের কাছে ছিলেন 'Single starred suspect' হিসাবে (no, 266 d. 9.8.58 R-438-Criminal investigation, in reply. Secret # 244. 11.10.58 F/N 606-48: PF, P. 28), আর তিনিই পর্যায়ক্রমে হয়ে উঠলেন বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি অর্জনের একমাত্র তারকা। বঙ্গবন্ধু '৬৬ সালে ৬ দফার পক্ষে গড়ে তুললেন বিপুল জনসমর্থন, সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সমান্তরাল সরকার। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে পূর্ববাংলার জনস্রোত আলোড়িত হলো, গণমানুষ হয়ে উঠল মুক্তিপাগল। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বাঙালি জাতিকে শোনালেন স্বাধীনতা ঘোষণার স্পষ্ট বাণী। সব দিকনির্দেশনাপূর্ণ ভাষণে উজ্জীবিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অনুধাবনে এলো 'The dye was already cast.' বঙ্গবন্ধু সচেতনভাবে স্মরণ রাখলেন সার্বভৌমত্বের সমতার কথা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাত্রা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও দায়িত্ববান ছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে Unilateral declaration of Independence (UDI)-এ যাননি। সার্বভৌমত্বের সমতার (Sovereign equality) ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্রে (Nation state) সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে রক্ষণশীল হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র আরেকটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ব্যাপারে সহসা মন্তব্য করে না। কারণ এটি অন্য একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের শামিল। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে গোটা বাঙালি জাতিকে যা যা করণীয় তার সব নির্দেশনা দিয়ে রাখলেন, একই সঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে তিনি সরাসরি রাজনীতির আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও Conventional wisdom বিবেচনায় রাখলেন। দীর্ঘ সময়জুড়ে গড়ে তোলা জনমতকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক পৌরুষ দিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের দিকে নিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা (Biafra) হতে চাননি। তিনি UDI-এ যাননি বলেই বিশ্ব মতামত ও সুশীল মানবতার অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। নোবেল বিজয়ী ফরাসি চিন্তাবিদ আঁদ্রে মালরো ৮০ বছর বয়সকালেও তাই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে এসে মালরো এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করলেন।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক বিপ্লবের এই বিপুল কর্মযজ্ঞ শুধু বঙ্গবন্ধুর মতো বিরল ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। আজ যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সুযোগে ইতিহাসকে নিজেদের দখলে নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা, বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করার দুঃসাহস দেখায়, মূলত তাদের অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক অপকৌশলই এর মধ্যে ফুটে ওঠে। বহু চেষ্টায়ও এতে বঙ্গবন্ধুকে ছোটো করা যাবে না বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে দীর্ঘ রাজনীতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন ইতিহাসে, তাতে তিনি শুধুই প্রসারিত হবেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা ছড়িয়ে দেন। একজন দক্ষ রাজনীতিকের ভূমিকা পালন করাতে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সেদিন ঐক্যবদ্ধ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে। অনেক প্রাণ, সম্ভ্রম ও মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর সব মমতা দিয়ে দেশ গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে বলীয়ান করে তোলার সুপরিকল্পনা নিয়ে এগোলেন দক্ষ রাষ্ট্রনায়কের মতো। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট অকস্মাৎ নারকীয়ভাবে হত্যা করা হলো বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। পরাজিত হলো বাংলাদেশ, সুবিধা লুটল হত্যাকারীরা। তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বিমেরুকরণ অবস্থিতি হত্যা-রাজনীতির একটি নেপথ্য কারণ হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক বিল ক্লিনটনও বাংলাদেশ সফরে এসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকার করে গিয়েছেন অকপটে। বঙ্গবন্ধুর মতো প্রবল ব্যক্তিত্ববান নেতা কোনো বশ্যতামূলক বন্ধুত্ব মেনে নেননি। আবার অন্যদিকে দেশের ভেতরকার সামরিক বাহিনীকে জনগণের কাতারে এনে জনসেবার কাজে নিয়োজিত করেছেন। শক্তির রাজনীতিতে প্রলুব্ধ বিশেষ গোষ্ঠীকে নিবৃত করেছেন। কখনো কখনো ক্ষমা করার ঔদার্য দেখিয়েছেন এই বিশ্বাসে–'Will not force is the basis of state'. কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের নীলনকশা থেকে বেরোয়নি। মুক্তিযুদ্ধবিধৌত মূল্যবোধ পদদলিত করে পাকিস্তানি ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হলো বাঙালির জন্য কলুষিত একটি দাগ। যে ঘোর অমানিশায় আমরা নিক্ষিপ্ত হলাম, তা যেন আর অতিক্রম করা গেল না। শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথে যেমন বলা হয়েছে, 'The night is long that never finds the day'. পনেরোই আগস্টের রক্তে আজ গোটা বাংলাদেশ রক্তাক্ত। কিন্তু সেই রক্তের ভেতর দিয়ে শানিত হয় মানবচেতনা। তাই বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিকভাবে অক্ষয় এক শক্তি। যুগের পর যুগ তাঁর চেতনায় মানুষ আত্মশক্তি খুঁজে পাবে, একাত্মবোধ করবে, সংগঠিত হবে, বলিষ্ঠ হবে। রাজনৈতিক বিরল ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু এখানেই স্বতন্ত্র, শক্তিমান এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান। বঙ্গবন্ধু আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে জুলিয়াস সিজারের অভিব্যক্তির মতোই '...constant as the northern star', বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ধ্রুবতারা। আমাদের আলোকদিশারি।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এদেশের ইতিহাসে দিঘল এক কালরাত্রি। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সজীব প্রাপ্তিগুলো সংবিধানবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সব অগ্রসরতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে। পেছনে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো উন্নয়নের চাকাকে। জাতির পিতাকে হত্যার জন্য বিশ্বের সুশীল মানবতা আমাদের ধিক্কার জানাল। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের ওপর নেপথ্যে চলছে অন্য রাষ্ট্রের ভাবধারা প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস। এই জনপদের অঞ্চলে অঞ্চলে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ছে। নিগৃহীত হচ্ছে ধর্মের মূল আবেদন। আমাদের স্বপ্নে বুনা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আজ বিপন্ন মানবতায় বাকরুদ্ধ। এসব অশুভ পাঁয়তারাকে প্রতিহত করতে হবে সুদৃঢ় ঐক্যের বাঁধনে। একাত্তরের চেতনায় জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের স্থগিত সজীবতাগুলো। আধুনিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার যে মর্মবাণীতে বঙ্গবন্ধু সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছিলেন, সেই মৌলিক ভাবনাগুলোকে সমুন্নত রেখে অর্থনৈতিক অগ্রসরতার উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। এই রাষ্ট্রের বঞ্চিত বাসিন্দারা আজ ধর্ম-শাসনের ধূম্রজাল চায় না, সঠিক অর্থনৈতিক নীতিমালার ভিত্তিতে প্রকৃত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিই আমাদের কাম্য, যা ছিল বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সাধনা।

লেখক: বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। ২০০৮ সালের ৪ অক্টোবর তিনি মারা যান

কাছ থেকে দেখা

ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড

আ. ফ. ম. মহিতুল ইসলাম মুহিত

দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা যশোর জেলা থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র জমা দিতে এলাম। স্টেডিয়াম মাঠে বঙ্গবন্ধুর কাছে মুজিববাহিনীর চার আঞ্চলিক প্রধানের অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে অস্ত্র জমা শুরু হলো। বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম। মনে হয়েছিল আজ আমি ধন্য। আমার অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব, আমার সারা জীবনের স্বপ্নের মানুষকে আজ স্বচক্ষে দেখলাম। আমি জমা দিয়েছিলাম একটি স্টেনগান। অস্ত্র জমা দিয়ে সচিবালয়ে আমার এক আত্মীয়ের কাছে এলাম। তিনি সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। হঠাৎ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি চাকরি করব কি না?

আমি জানতে চাইলাম, কোন ডিপার্টমেন্টে?

উনি বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে, গণভবনে।

আমার ধমনিতে এক অপূর্ব শিহরণ জাগল। মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। আমি আমার স্বপ্নের মানুষের কাছে চাকরি করব। আমি আনন্দে আত্মহারা। অনেকক্ষণ বসেছিলাম। উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন। আমি দ্বিতীয় বাক্যবিনিময় না করে রাজি হয়ে গেলাম। বাহাত্তর সালের ১৩ ডিসেম্বর আমি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অফিস সহকারী হিসাবে যোগদান করলাম।

অল্পদিনেই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সহকর্মীদের মাঝে সুপরিচিত হয়ে গেলাম। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতির বাসভবনের (৩২নং বাড়ি) অভ্যর্থনাকারী কাম ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে নিয়োগ পেলাম আমিসহ আরও তিনজন। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সেকশন অফিসার আলাউল হক ওই বাড়ির বাসিন্দাদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যথারীতি আমরা আমাদের ডিউটি শুরু করে দিলাম। গাড়ি বারান্দা দিয়ে উঠতেই হাতের বাঁয়ে ছিল আমাদের অফিস রুম। আমাদের সামনের রুমে বসতেন পুলিশের সহকারী কমিশনার (ডিএসপি)।

১৪ আগস্টের রাত। রাত্রিতে ডিউটি ছিল আমার সহকর্মী ছাফদারের। কিন্তু রাতে ওর ব্যক্তিগত কাজ থাকায় আমাকে ডিউটি করতে অনুরোধ করল। আমার দুপুরের ডিউটি ছাফদার করল। সন্ধ্যা ৭-৩০ মি. সময় গাড়ি এলো। ৮টায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ৩২নং-এ পৌঁছলাম। ছাফদার চলে গেল। রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত গেটে পাহারারত আর্মিদের সঙ্গে গল্প করলাম। ১টা ১০ মিনিটে আমাদের জন্য নির্বাচিত বিছানায় শুতে এলাম লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই।

হঠাৎ টেলিফোনে ডাকছেন। সম্ভবত তখন সময় ভোর ৪-৩০ বা ৫টা। চারদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি তড়িঘড়ি করে এসে টেলিফোন ধরলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, 'সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাগা।'

আমি টেলিফোন লাগানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে চেষ্টা করছি, সে মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু আমার সামনে এলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হলো পুলিশ কন্ট্রোল রুমের?'

আমি বললাম, স্যার, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ধরছে না। আমি গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন পেয়ে গেলাম। আমি বলছিলাম, হ্যালো, আমি পিএ টু প্রেসিডেন্ট বলছি। ও প্রান্ত থেকে কোনো উত্তর এলো না; কিন্তু টেলিফোন রিসিভার সম্ভবত অপারেটরের হাতে ছিল। আমি হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে রিসিভার নিলেন। বললেন, আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি। ঠিক তখনই এক ঝাঁক গুলি আমাদের অফিস কক্ষের জানালার গ্লাস ভেঙে দেওয়ালে লাগল। অন্য টেলিফোনে চিফ সিকিউরিটি অফিসার জনাব মহিউদ্দিন সাহেব টেলিফোন করল। আমি ধরলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গ্লাস ভাঙা আমার ডান হাতের কনুইয়ের কাছে এসে বিঁধল। কেটে রক্ত ঝরা শুরু করল। দুই জানালা দিয়েই ভীষণ গুলি আসছে। বঙ্গবন্ধু আমার টেবিলের পাশে শুয়ে পড়লেন। আমি দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ি। আমিও বঙ্গবন্ধুর পাশে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠলাম। ওপর থেকে চাকর আবদুল ওনার পাঞ্জাবি ও চশমা নিয়ে এলো। আমার কক্ষে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবি পরলেন। বারান্দায় এসে বললেন, আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি, এত গুলি চলছে, তোমরা কী করো? ওপরে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর শেখ কামাল ভাই নিচে বারান্দায় এসে বলল, আর্মি-পুলিশ ভাই, আসুন আমার সাথে–কথা বলার সাথে সাথে তিন-চারজন কালো পোশাকধারী লোক সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ও ডিএসপি নুরুল ইসলাম সাহেব কামাল ভাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে। ডিএসপি নুরুল ইসলাম সাহেব আমাকে পেছন দিক থেকে টান দিয়ে অফিসকক্ষের মধ্যে নিয়ে গেলেন। অফিসকক্ষের ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মাঝামাঝি হাত রেখে আমি বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ওখানে কী হচ্ছে। গুলির শব্দে কামাল ভাই হঠাৎ আমার কাছে এসে ছিটকে পড়লেন। আমিও পড়ে গেলাম ওনার পেছনে। কামাল ভাই বললেন, আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।

কালো পোশাকধারীদের সাথে খাকি পোশাকধারীও দেখলাম। আমার ধারণা ছিল দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করছে। তাই ওনারা আমাদের সেফ করতে এসেছে। আমাদের দুষ্কৃতকারী ভাবছে। তাই আমি বললাম, ভাই উনি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল। ওরা বার্স্ট ফায়ার করল। শেখ কামালের উরুর ওপরে বুক ফুঁড়ে একটা গুলি লাগল আমার হাঁটুর মাঝে। কামাল ভাইয়ের রক্ত ও আমার রক্ত প্রায় একাকার হয়ে গেছে। কোনার পুলিশ বক্স থেকে ওদের লক্ষ্য করে গুলি এলো। ওরা ওইদিকে পজিশন নিল। ডিএসপি সাহেব কামাল ভাইয়ের লাশ ধাক্কা দিয়ে আমাকে বের করে ওনার কক্ষে নিয়ে এলেন। ডিএসপি সাহেবের পা দিয়েও প্রচুর রক্ত ঝরছে। ওখানে দেখি এসবির সাব-

> শিশু রাসেল আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো? আমার ধারণা ছিল, ঘাতকরা অন্তত শিশু রাসেলকে মারবে না। সেই ধারণাতেই আমি বললাম, না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না

ইনস্পেকটরের রিভলবার পায়ের কাছে পড়ে আছে। উনি দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। ডিএসপি সাহেব আমাদের পেছন গেট দিয়ে জোর করে বের করে আনলেন। গেটের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন আর্মি আমাদের চুল ধরে টেনে দাঁড় করাল। আমি বললাম, রাতে আমাদের ডিউটি ছিল, তাই এসেছি।

আর্মি বলল, ঠিক আছে আপনাদের কিছু বলব না, ওখানে লাইনে দাঁড়ান। দেখি, মেইন গেটের সামনে কয়েকজন পুলিশসহ টেলিফোন মিস্ত্রি লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও লাইনে দাঁড়ালাম। টেলিফোন মিস্ত্রি মতিনের পাশে ডিএসপি সাহেব, আমি, আমার পরে এসবির সাব-ইনস্পেকটর দাঁড়াল। হঠাৎ একজন আর্মি এসে এসবির সাব-ইনস্পেকটরকে গুলি করল। গুলি বামদিকের বুকে লাগে। বুকের মাংস কিমা কিমা হয়ে আমার ও ডিএসপি সাহেবের মুখে লাগে। সাব-ইনস্পেকটর পড়ে যান। মুখ দিয়ে এক পশলা রক্ত ওঠে এবং তিনি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সাব-ইনস্পেকটরকে মেরে রাইফেল আমার দিকে তাক করল। সেই মুহূর্তে আরেকজন আর্মি এসে ধমক দিয়ে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। বলল, তোমাকে এদের মারতে কে বলেছে? ওই আর্মির আচরণ দেখে মনে হলো উনি একজন অফিসার, যদিও তাদের কোনো ব্যাচ ছিল না। ওই আর্মির জন্য আমার

জীবন রক্ষা হলো। দেখলাম রাইফেলবিহীন ব্যক্তিকে বারান্দায় নিয়ে রাইফেলটা দিয়ে দিল। তারপর ৪/৫ জন আর্মিকে আমাদের পাহারায় রেখে বার্স্ট ফায়ার করতে করতে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস...। ...গুলির শব্দ। মহিলাদের আর্তচিৎকার। এর ভেতর নিচের রান্নাঘর ও গোয়ালঘর থেকে রান্নার বুড়ি ও রাখাল আজিজকে আমাদের লাইনে এনে দাঁড় করাল। নাসের কাকার হাতের আঙুলগুলো সাদা কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো। রক্ত ঝরছিল। তাতে মনে হচ্ছিল ওনার আঙুলগুলো গুলিতে উড়ে গেছে। নাসের কাকা বললেন, স্যার, আমি তো রাজনীতি করি না, কোনো রকম ব্যাবসাবাণিজ্য করে খাই। পাশে দাঁড়ানো একজন ঘাতক বলল, 'শেখ মুজিব বেটার দ্যান নাসের।'

'যে ঘাতক গান পয়েন্টে নাসের কাকাকে নিয়ে এসেছিল সেই বলল, ঠিক আছে। আপনাকে কিছু বলব না। আপনি ওই কক্ষে গিয়ে বসুন।'–বলে আমাদের লাইন থেকে বের করে আবারও গান পয়েন্টে আমাদের অফিসকক্ষের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুমে নিয়ে গুলি করল। তারপর ঘাতক ফিরে এলো গেটের সামনে। নাসের কাকা হঠাৎ 'পানি' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ঘাতক বলল, যা পানি দিয়ে আয়, সেই ঘাতক পানির পরিবর্তে আবারও গুলি করল। নাসের কাকার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর এক ঘাতক শিশু রাসেলকে নামিয়ে নিয়ে এলো। শিশু রাসেল আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো? আমার ধারণা ছিল, ঘাতকরা অন্তত শিশু রাসেলকে মারবে না। সেই ধারণাতেই আমি বললাম, না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না। এক ঘাতক আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেইন গেটের ডান পাশে পুলিশ বক্সে নিয়ে গেল। রাসেল কাঁদছিল। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ঘাতকের কাছে কেঁদে আবেদন জানাচ্ছিল। ঘাতকটি রাসেলকে ওখানে একজনের পাহারায় রেখে ভেতরে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পর এসে বলল, চলো, তোমাকে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে আসি। বলে ভেতরে নিয়ে গেল। ওই বাড়ির সব কণ্ঠস্বর থেমে গেল। সর্বশেষ হত্যাটি ছিল, শিশু রাসেলকে।

আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ওদের অনুমতি ছাড়াই বসে পড়লাম। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। লুঙ্গিটা পায়ের সাথে লেগে গেছে। এক ঘাতক ভেতর থেকে একটা ছোটো ময়লা লুঙ্গি এনে দিয়ে পরনের লুঙ্গি পালটাতে বলল। আমি বহুকষ্টে লুঙ্গিটি পালটিয়ে নিলাম। ঘাতক আমার গায়ের রক্তমাখা গেঞ্জিটিও খুলে নিল। আমাদের অফিসকক্ষে চেয়ারের হাতলে রাখা কামাল ভাইয়ের রক্তমাখা আমার হাফ শার্টটি এনে দিল এক ঘাতক। কাজের ছেলে আবদুল ও রমাকে আমাদের লাইনে নিয়ে এলো। দেখলাম আবদুলের পেটে ও হাতে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে। লাইনে দাঁড়ানো বুড়ি আমাকে ও আবদুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘাতকদের বারবার অনুরোধ করছিল। বঙ্গবন্ধুর মিলিটারি সেক্রেটারি এবং ডিজিএফআই-এর ডিরেক্টর কর্নেল জামিলও নিহত হয়েছিলেন ঘাতকদের গুলিতে শুক্রাবাদের মোড়ে। তাঁর মৃতদেহ তাঁর লালরঙা টয়োটা গাড়িতে করে নিয়ে আসা হলো ৩২ নম্বর বাড়ির ভেতর। দেখলাম কর্নেল জামিলের মানিব্যাগ ও হাতের দিকে। আমার ঘড়িটিও নেই। অন্য এক সেপাই হাতে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত সকাল ৮-৩০ বা ৯টার দিকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে গেল।

লেখক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে কর্মরত ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বাদী। মহান মুক্তিযুদ্ধে মুজিববাহিনীর হয়ে রণাঙ্গনে সশস্ত্র লড়াই করেছেন। ২০১৬ সালের ২৫ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন

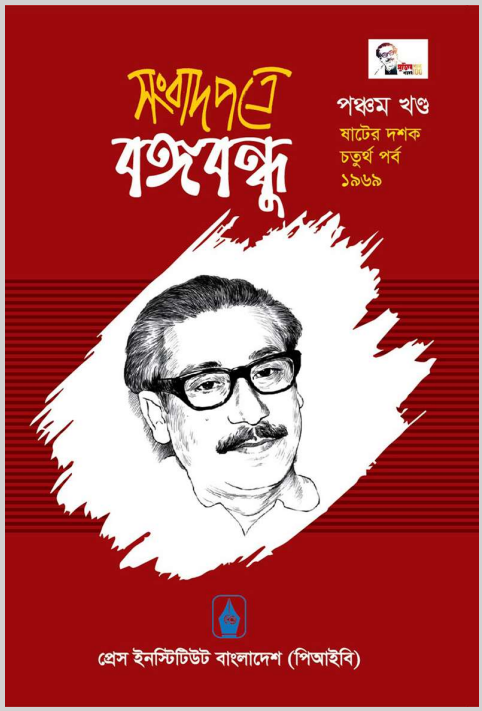

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

কাছ থেকে দেখা

লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ, পিএসসি

১৯৭৫ সাল। বছরের প্রথম থেকে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ক্যান্টনমেন্টের হালচাল মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও ভেতরে ভেতরে একদল তরুণ অফিসারের মধ্যে চাপা অসন্তোষ গুমরে মরছিল।

সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে ভালো মিল-মিলান ছিল না। জিয়ার সঙ্গে সফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফের বনিবনা ছিল না। খালেদ মোশাররফ শেখ সাহেবের প্রিয় অফিসার ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছিল, সফিউল্লাহর পর তাকে চিফ অব স্টাফ বানানো হবে। জিয়াউর রহমানকে শেখ সাহেব তত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, অবশ্য এর অন্যতম কারণ ছিল তার বিরুদ্ধ পক্ষের লোকদের দ্বারা ক্রমাগত কানভারি করা। জিয়ার অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন কর্নেল খুরশিদ, যিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ সাহেবের সহযোগী ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্তদের মধ্যে একজন। জিয়া কর্নেল খুরশিদকে দিয়ে উত্তাপ কিছুটা প্রশমন করতে সক্ষম হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। এ সময়ে জিয়াকে পূর্ব জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর প্ল্যান-প্রোগ্রাম প্রায় ঠিক হয়ে যায়। এ নিয়ে জিয়ার মনমেজাজ ভালো ছিল না। তিনি খুব বিমর্ষ ছিলেন।

বেশকিছু তরুণ সেনা অফিসার ১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে চাকরিচ্যুত হন। স্বভাবতই তারা শেখ সাহেবের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিল, এদের মধ্যে ছিল মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর রাশেদ, মেজর পাশা প্রমুখ। এরা বহিষ্কৃত হলেও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নির্বিবাদে ঘুরাফেরা করতে দেখা যায়।

মেজর জলিলও সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। কর্নেল তাহেরের একটি বিপ্লবী গ্রুপ গোপনে তৎপর ছিল। কর্নেল জিয়াউদ্দিনও আন্ডারগ্রাউন্ড সর্বহারা পার্টির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। বাহ্যিক না হলেও সেনাবাহিনীর ভেতরে-ভেতরে এসব

বহিষ্কৃত অফিসার শেখ সাহেবকে উৎখাতের গোপন চিন্তা-পরিকল্পনা করছিল। এসব কথা শেখ সাহেবের একেবারে অজানা ছিল না।

সম্ভবত এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই শেখ সাহেব রক্ষীবাহিনীর ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এই বাহিনীকে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি আরেকটি বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস পান। কিন্তু এটা পুরোপুরি বাস্তবায়নের আগেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রক্ষীবাহিনীর অফিসার ক্যাডার ছিল খুবই দুর্বল, অনভিজ্ঞ। যার জন্য চরম মুহূর্তে তারা সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া বাহিনীপ্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ছিলেন দেশের বাইরে।

শেখ সাহেবের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। এমনকি বাসভবনের নিরাপত্তাব্যবস্থা বলতেও বিশেষ কিছুই ছিল না। সেনাবাহিনীর বাইরে-ভেতরে কিছু জুনিয়র অফিসারের ভেতর অসন্তোষ বাড়ছিল; কিন্তু বাহ্যিক সব স্বাভাবিকই ছিল। কোনো সিনিয়র অফিসার এসবে সরাসরি জড়িত ছিলেন না, তবে ইন্ধন জোগানোর কথা হয়তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বহুল আলোচিত মেজর ফারুক ছিলেন বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। কর্নেল মোমেন ছিলেন কমান্ডিং অফিসার। সুতরাং তাকে ডিঙিয়ে মেজর ফারুক পুরো ইউনিট নিয়ে বড়ো একটা কিছু করে বসবে, তা কারও চিন্তায় আসেনি। ১৫ আগস্ট কর্নেল মোমেন ছিলেন ছুটিতে। সম্ভবত ফারুক দিনক্ষণ সেভাবেই ঠিক করে। মেজর রশিদ অবশ্য ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। অত্যন্ত সাদাসিধে নম্র-ভদ্র, বিনয়ী অফিসার। আমার স্টেশন হেডকোয়ার্টারের ঠিক পূর্বপাশেই ছিল তার ইউনিট। প্রায়ই দেখা হতো; কিন্তু তার ভেতরে যে এত আগুন জ্বলছিল, তা কোনো সময় ধারণা করতেই পারিনি। দেশে চোরাচালান রোধে সীমান্তে নিয়োগ করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা কঠোরভাবে কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বহু স্থানে স্থানীয় এমপি ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে শেখ সাহেব রুষ্ট হন। তিনি সেনাবাহিনীকে আবার ব্যারাকে ফিরিয়ে আনেন। তিনি খুবই খ্যাপে যান। সেনাবাহিনীকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলে। রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় যথেষ্ট ভাটা পড়ে। অবস্থা মোকাবিলায় শেখ সাহেব সব পার্টি বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠন করেন। এতে অবস্থা আরও খারাপ হয়। জনমনে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও কদিন আগেই ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ করেছি। কী আশ্চর্য, মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে আজ এই অবস্থা। বলা বাহুল্য, ভারতবিদ্বেষী মনোভাব সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যেও চাপা দেওয়া ছিল, অবশ্য তা পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসার জন্য অবশ্যই নয়। অবাক হলেও সত্য, সেনাবাহিনীর মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জিয়া, সফিউল্লাহ, খালেদসহ প্রায় সব অফিসারের মধ্যেই এই মনোভাব প্রকট ছিল। এমনকি জেনারেল ওসমানীর মধ্যেও। আসলে ভারতের মাতব্বরি তাদের কেউ পছন্দ করেনি। মুক্তিযুদ্ধে যৌথভাবে একসঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হলেও ভারতীয় বাহিনী বহির্বিশ্বে বিজয় অভিযানের সাফল্য ও কৃতিত্ব এককভাবে দাবি করে। এতে মুক্তিবাহিনীর অফিসাররা নাখোশ ছিল। এছাড়া বাংলাদেশ ত্যাগ করার সময় তারা লুটের মালামাল, অস্ত্রশস্ত্র সবই ট্রাকবোঝাই করে ভারতে নিয়ে যায়। এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব নানাবিধ অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে ১৫ আগস্ট যখন ক্ষুদ্র সেনা গ্রুপের অভ্যুত্থান হলো, তখন জনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো না। একজন জাতীয় বীর ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জনকের পতনে কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত হলো না। সবকিছু তাসের ঘরের মতো এক আঘাতেই ভেঙে পড়ল। অবাক ব্যাপার নয় কি?

আগস্ট অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিল না। এতে কোনো সিনিয়র অফিসার সংযুক্ত ছিলেন না। এটার সাফল্য সম্ভব হয়েছিল একমাত্র নেতার মৃত্যুর কারণেই। তা না হলে নির্ঘাত ব্যর্থ হতো।

ওই সময় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বড়ো রকমের কোনো অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল না, ফ্রিডম ফাইটার ও নন-ফ্রিডম ফাইটারদের মধ্যে কিছুটা মনকষাকষি ছিল প্রমোশন ও সিনিয়রিটি কাঠামো নিয়ে। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই মানিয়ে চলছিল। বুট-ইউনিফর্ম ইত্যাদির কিছুটা ঘাটতি ছিল। এমন সময় গুজব ওঠে যে রক্ষীবাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার দিয়ে সাজানো হচ্ছে। সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসাবে রক্ষীদের গড়ে তোলা হচ্ছে। ব্যাপারটা একেবারে অমূলক ছিল না। মৃত্যুর ছয় মাস আগে শেখ সাহেবের সঙ্গে আমার একবার অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ হয়। তিনি সেনাবাহিনীর অফিসারদের ক্ষমতালিপ্সা, প্রমোশনলিপ্সা, একে অন্যের প্রতি কামড়া-কামড়ি এসব লক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো তরুণ অফিসার তার দলের লোকদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ ও শক্তি প্রদর্শনে লিপ্ত হয়। সেনাবাহিনীর এ ধরনের আচরণ নিয়ে তিনি খুবই বিব্রতবোধ করেন। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রক্ষীবাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন বলে তার কথা থেকে আমার তখন ধারণা হয়। সে যাই হোক, তার পদক্ষেপ সেনাবাহিনীতে গুজব ও পরে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। এসব সত্ত্বেও তার অনুগত সেনাবাহিনীর দিক থেকে কোনো বড়ো রকম বিদ্রোহ আশঙ্কা কারও মাথায় আসে না, তবে জুন মাসের দিক থেকে তার বাসায় নিরাপত্তাব্যবস্থা কিছুটা জোরদার করা হয় এবং একটি সেনাবাহিনীর প্লাটুন তাঁর বাসায় প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়।

ভাগ্যের পরিহাস, পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে তাঁরই সৃষ্টি মুজিব ব্যাটারি গোলন্দাজ বাহিনীর একটি প্লাটুন তাঁর পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তাদের উপস্থিতিতেই ১৫ আগস্টের ভোরে তাঁর বাসা আক্রান্ত হয়। তারা নীরব ভূমিকা পালন করে। বাসার ভেতর থেকে শেখ কামাল ও অন্যরা এককভাবে আক্রমণকারীদের বাধা দিতে থাকে। আরও আশ্চর্য, এত গোলাগুলি সত্ত্বেও সামান্য দূরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসেনি। তারা ঠায় দাঁড়িয়ে গোলাগুলির শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

শেখ সাহেব ফোনও করেছিলেন বিভিন্ন দিকে। আর্মি চিফ সফিউল্লাহকেও। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেনাপ্রধান তার বাহিনী তৈরি করতে করতেই সব শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ লাঠি আনতে আনতে কিলেই শেষ। সফিউল্লাহকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, পূর্ব প্ল্যান না থাকলে পেশাদার বাহিনীর Reaction সব সময়ই স্লো হবে। নির্দেশ স্তরে স্তরে নিচে নামে।

১৪ আগস্ট। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। অন্যান্য দিনের মতো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ওইদিনও সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছিল। বিকেলে জিয়া, সফিউল্লাহসহ আমরা কজন সিনিয়র অফিসার টেনিস কোর্টে যথারীতি টেনিস খেলছিলাম। সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক। ছাউনির রাস্তায় কোথাও কোনো অস্বাভাবিক মুভমেন্টও নজরে পড়ল না। কিন্তু আমাদের সবার অজান্তেই ওই রাতে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে দানা বেঁধে উঠছিল বিশাল কালো মেঘ। ঘড়ঘড় করে উত্তর দিকে বের হয়ে গেল বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাঙ্কগুলো। ক্যান্টনমেন্টের রাস্তা ধরে উলটোদিকে বের হয়ে গেল এক এক করে কামানবাহিনীর ট্রাকগুলো। কারও কোনো সন্দেহ জাগেনি, কারণ, বৃহস্পতিবার রাতে আর্মির নৈশকালীন মহড়া চলে রুটিনমাফিক।

সবাই ধরে নিল সাধারণ ট্রেনিংয়ে বের হয়েছে কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান সৈনিকবৃন্দ। তারা সমবেত হলো বর্তমান এয়ারপোর্টের উন্মুক্ত

মাঠে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, রাতের অন্ধকার জমে উঠল নাটক মেজর ফারুক ও রশিদের পূর্বপরিকল্পিত অভিযানে। তারা এগিয়ে যাবে ধানমন্ডির ৩২নং রোডের দিকে। টার্গেট শেখ সাহেবের বাসা। রাতের অন্ধকারে তাদের সঙ্গে যোগ দিল মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর পাশা, মেজর রাশেদ। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার, হুদা, কিসমত ওরা ইউনিটেই ছিল। ভাইসব, দেশ লুটেরারা লুটে নিচ্ছে। মা-বোনদের ইজ্জত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশ ভারতের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা সৈনিকরা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। আসুন, এগিয়ে যাই, জালিমকে উৎখাত করি। আজ আমাদের পরীক্ষার দিন।

বিপ্লবী দুই ব্যাটালিয়ন। বেঙ্গল ল্যান্সার আর সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি সৈনিকদের কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না। তারা হলো গড্ডালিকার দল। তারা চায় নির্দেশ। তারা নির্দেশ পেয়ে এবার এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। সবার কাছে তাজা বুলেট ইস্যু করা হলো, কামানের গোলাও নেওয়া হলো। শুধু ট্যাঙ্কের গোলা ছিল না। ফারুক সমাগত অফিসারদের প্ল্যান বুঝিয়ে দিল। যার যার টার্গেট ও কর্তব্য বুঝিয়ে দিল। তাদের অপারেশন প্ল্যান ছিল অতিসাধারণ। মেজর ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে যাবে শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারে, ওদের মোকাবিলা করতে। মেজর রশিদ সেকেন্ড ফিল্ড ইউনিট নিয়ে ঘেরাও করবে শেখ সাহেবের বাসা। ডালিম, কিসমত ওরা যাবে রেডিয়ো স্টেশন দখল করতে। একই সঙ্গে শেখ মণি, সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ হবে। সব ইউনিট জেগে উঠেছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর সৈনিকরা সকাল বেলার পিটি করতে রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় আগুয়ান সৈনিকদের। কেউ বুঝতে পারল না কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে যাচ্ছে এক অভাবনীয় ঘটনা।

তেজগাঁও এয়ারপোর্টে এসে একটি গ্রুপ এগিয়ে গেল ধানমন্ডির দিকে, আরেকটি গ্রুপ এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের দিকে, মেজর ফারুক সামনে। রক্ষীবাহিনীর সৈনিকরাও ভোরবেলা তৈরি হচ্ছিল পিটি প্যারেডে। তাদের সামনে দিয়েই ট্যাঙ্কগুলো সদর্পে এগিয়ে যায়। তারা তাকিয়ে-তাকিয়ে উপভোগ করছিল। সুবেদার মোসলেহ উদ্দিনকে দেওয়া হয় শেখ মণির বাসা। সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম দেওয়া হয় তাৎক্ষণিকভাবে ওই স্থানে ওই মাঠেই। এর আগে শুধু ফারুক ও রশিদ ছাড়া এসব প্ল্যান কেউ জানত না। অপারেশনের গোপনীয়তাই ছিল সাফল্যের অন্যতম কারণ। সহজ প্ল্যান বুঝে নিতে অফিসারদের মোটেই অসুবিধা হয়নি। অবাক হলেও সত্য, রাতভর ধরে এসব প্ল্যান-প্রোগ্রাম চলছিল ফিল্ড সিকিউরিটি ইউনিটের পাশেই, তাদের নাকের ডগার উপর। সারারাত চলল প্রস্তুতি। ভোরবেলা ৪টায় শুরু হলো যাত্রা। লক্ষ্যস্থল ধানমন্ডির ৩২নং সড়ক। ঘড়-ঘড়-ঘড় বিকট শব্দে বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাঙ্কগুলো এয়ারপোর্ট রোড ধরে গড়িয়ে যাচ্ছিল। বাস্তবতা কী নির্মম! ৩২নং সড়ক ঘেরাও করা হয়। শেখ সাহেবের বাসভবনে হামলা শুরু হয়ে গেল। গার্ডদের আগেই হাত করা হয়েছিল, কোনো বাধা আসেনি। ততক্ষণে বাসার লোকজন জেগে উঠেছে। বাসা আক্রান্ত হয়েছে দেখে তারা গুলি ছুড়ল। শুরু হয়ে যায় তুমুল গুলিবিনিময়। কামান-মর্টার থেকে লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ করা হলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দূরে জনবসতি এলাকায় পড়ে লোক মারা গেল। দুদিক থেকে প্রবল গুলিবর্ষণ। শেখ কামাল নিচতলায় এসে গুলি বিনিময় করছিলেন। একসময় কামাল গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর সঙ্গে নিহত হন একজন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার। কামাল গুলিবিদ্ধ হয়েছে জেনে দোতলা থেকে নিচে নামতে থাকেন শেখ সাহেব। সিঁড়ির মুখেই তিনি আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হন। অসম সাহসে তিনি হামলাকারীদের শাসাতে থাকেন। তাদের হাতিয়ার নামিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন। ঠিক এই সময় একজন আক্রমণকারীর স্টেনগান থেকে একরাশ বুলেট বেরিয়ে গেল। লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়ির ধাপেই ইতিহাসের মহানায়ক। শেখ সাহেবের বাসায় আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে আক্রমণ চালানো হয় শেখ মণি ও সেরনিয়াবাতের বাসায়। প্রথম আক্রমণেই তারা দুজন নিহত হন। পুরো ঘটনা ঘটে গেল নাটকীয় দ্রুততায়। ওদিকে রেডিয়ো স্টেশন দখল করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সকালবেলা রেডিয়ো খুলেই সবাই শুনতে পেল মেজর ডালিমের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর–'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'।

> সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েই চমকে উঠলাম। সিঁড়ির মাঝখানেই প্রায় বসার ভঙ্গিতে শায়িত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। দেহ তাঁর নিশ্চল, নিশ্চুপ। সারা সিঁড়ি বেয়ে রক্তের বন্যা। মাথা কাছে নিয়ে দেখলাম বার্স্ট ফায়ারে তাঁর বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে। অক্ষত মুখমণ্ডল, যেন ঘুমিয়ে আছেন

স্তব্ধ দেশবাসী। নির্বাক আবালবৃদ্ধবনিতা। ক্যান্টনমেন্টে বসে আমরাও ঘোষণা শুনে হতবাক। কে হত্যা করল? কারা ক্যু করল? কে নেতৃত্ব দিচ্ছে? কতশত প্রশ্ন!

দুপুর গড়ানোর আগেই সবকিছু স্পষ্ট বসে গেছেন। সেনাবাহিনী প্রধান, নৌপ্রধান, বিমানবাহিনী প্রধান সবই বয়াত গ্রহণ করে ফেলেছেন। পুলিশ, বিডিআর প্রধান তারাও শপথ নিয়েছেন। বলা যেতে পারে নাটকীয় কায়দায় সবকিছুই ঘটে গেল ফারুক-রশিদের বন্দুকের নলের মুখে। ঘটনাপ্রবাহকে সবাই মেনে নিয়েছিলেন, তা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক।

দুপুরবেলা ৪৬তম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার ছিল সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব অফিসারই সেখানে জড়ো হয়েছে। কাঁধে স্টেনগান, ঠোঁটে বিরাট তৃপ্তির হাসি নিয়ে মেজর ফারুকের উপস্থিতি। সবাই তাকে জানাচ্ছেন কংগ্রাচ্যুলেশন। একসময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমাকে বললেন, হামিদ ভাই, পরিস্থিতি হয়তো যে কোনো দিকে মোড় নিতে পারে। আপনি তাড়াতাড়ি একটি স্টেশন Security Plan তৈরি করে আনুন, যাতে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করা যেতে পারে। আমি আমার অফিসে ফিরে গিয়ে প্ল্যান তৈরি করতে বসে গেলাম। বেলা আনুমানিক ৩টা নাগাদ জেনারেল সফিউল্লাহর ফোন এলো। তিনি বললেন, শহরে গিয়ে সিচুয়েশনটা দেখে আসতে, ৩২নং রোডের অবস্থাও দেখে আসতে, ১৪৪ ধারা জারির প্রয়োজন আছে কি না। আমি সিকিউরিটি প্ল্যানের একটা খসড়া দাঁড় করিয়েই আমার জিপ নিয়ে ছুটলাম শহরের দিকে অবস্থা পরখ করতে। আমি এয়ারপোর্ট রোড ধরে এগিয়ে গেলাম। রাস্তাঘাট সকাল থেকেই ফাঁকা। গাড়িঘোড়া নেই, একটি লোকও রাস্তায় নেই। মাঝেমধ্যে রাস্তার মোড়ে কিছু উৎসুক মানুষের জটলা। তারা মিলিটারি জিপ দেখে হাত নেড়ে উল্লাস ধ্বনি দিতে লাগল। একদিনেই এত পরিবর্তন। আমি অবাক হলাম। ৩২নং রোডে পৌঁছুলাম। গোলন্দাজ বাহিনীর সৈনিকরা জিপ থামাল। পরে চিনতে পেরে রাস্তা ছেড়ে দিল।

শেখ সাহেবের বাড়ির গেটে পৌঁছতেই মেজর পাশা, লে. হুদা এগিয়ে এলো। বাসার চতুর্দিকে গোলাগুলির ক্ষতচিহ্ন। পাশা বলল, বাসার ভেতর থেকে ওরাই প্রথমে গুলিবর্ষণ করে। তারা যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়। বাড়ির গেটের সামনে সাজিয়ে রাখা অনেকগুলো অস্ত্রশস্ত্র রাইফেল, মেশিনগান দেখাল। পাশা বলল, দেখুন স্যার, কত হাতিয়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল।

লে. হুদাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। প্রথমেই নিচে রিসিপশন রুমে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল শেখ কামালের লাশ। তাঁর পাশেই নিহত একজন পুলিশ অফিসার। পাশের রুমে, বাথরুমে পড়েছিল শেখ নাসেরের রক্তাক্ত মৃতদেহ। হুদা দুইতলার দিকে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েই চমকে উঠলাম। সিঁড়ির মাঝখানেই প্রায় বসার ভঙ্গিতে শায়িত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। দেহ তাঁর নিশ্চল, নিশ্চুপ। সারা সিঁড়ি বেয়ে রক্তের বন্যা। মাথা কাছে নিয়ে দেখলাম বার্স্ট ফায়ারে তাঁর বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে। অক্ষত মুখমণ্ডল, যেন ঘুমিয়ে আছেন।

তাকে ডিঙিয়ে উপরে উঠলাম, সিঁড়ির মুখেই ঘরের দেউড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন বেগম মুজিব। মনে হলো স্বামীর ওপর গুলির শব্দে ছুটে বেরিয়ে আসতেই গুলিবিদ্ধ হন। লুটিয়ে পড়েন দেউড়ির ওপর।

কামরায় ঢুকতেই করুণ দৃশ্য। একই কামরায় মেঝের ওপর পরিবারের অন্যান্যের মৃতদেহ। শেখ জামাল, মিসেস জামাল, মিসেস কামাল, মাস্টার রাসেল। সারা মেঝে রক্ত থইথই করছিল। আমার বুটের সোল রক্তের স্তরে ভরে গিয়েছিল। আমার মনে হলো ভয়ে সবাই এক কামরায় জড়ো হয়েছিল। কামরায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করা হয়। অন্তত দেহের আঘাত দেখে তাই মনে হলো। হুদাকে নিয়ে ঘরের এদিক-সেদিক ঘুরে আবার নিচে নেমে এলাম। বাড়ির পেছনে একটি লাল রঙের কারের ভেতর কর্নেল জামিলের মৃতদেহ। তাঁর ঠিক কপালে গুলি লেগেছিল।

হুদাকে বললাম, ঘরটা লক করে দিতে। তা না হলে সবকিছু লুটপাট হয়ে যেতে পারে। চারদিকে মৃত্যুর ছড়াছড়ি দেখে মনমেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। আমি জিপ চালিয়ে তাড়াতাড়ি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম। চিফ অব স্টাফকে বললাম, ১৪৪ ধারা জারির কোনো প্রয়োজন নেই। শহরের অবস্থা ঠিকই আছে। কোনো গণ্ডগোলের আশঙ্কা নেই।

বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো সারা ক্যান্টনমেন্টে। সবাই যার যার ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। গভীর রাতে ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। স্ত্রী নিষেধ করল ধরতে, তবুও ধরলাম। অপরপ্রান্তে মেজর মতিনের উত্তেজিত কণ্ঠ–স্যার, বঙ্গভবন থেকে বলছি, আপনার প্রতি নির্দেশ, শেখ সাহেবের বাসার সব লাশ আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই বনানী গোরস্থানে দাফন করার জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধু শেখ সাহেবের লাশ দাফনের জায়গা পরে জানানো হবে। রাত তখন প্রায় ৩টা। আমি স্টেশন ডিউটি ব্যাটালিয়নকে তৎক্ষণাৎ জড়ো হতে নির্দেশ দিলাম। এক প্লাটুনকে বনানীতে কবর খুঁড়তে নির্দেশ দিয়ে আমি কিছু সৈনিক নিয়ে শেখ সাহেবের বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। গভীর অন্ধকার রাত। আমি রাস্তায় আক্রমণ আশঙ্কায় রাইফেল নিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে বললাম। শেখ সাহেবের বাসায় পৌঁছে সব লাশ কফিনবন্দি করিয়ে একদল সৈনিক দিয়ে ট্রাকে করে বনানী পাঠিয়ে দিলাম। শুধু শেখ সাহেবের লাশ ওখানেই পড়ে রইল। আমি জিপ নিয়ে শেখ মণির বাসার দিকে এগিয়ে গেলাম। পথে মেজর আলাউদ্দিন এসে বলল, স্যার, ওদের বাসায় কোনো লাশ নেই। গোলাগুলির পর সব মৃতদেহ উঠিয়ে মর্গের দিকে নিয়ে গেছে। পরে মর্গে পৌঁছে তাদের লাশগুলো অন্যান্য প্রায় ১৫/২০টি পচা-গলিত লাশের সঙ্গে স্তূপীকৃত অবস্থায় দেখতে পাই। কর্তব্যরত একজন পুলিশ ইনস্পেকটরের সহায়তায় তাদের লাশ আলাদা করে বনানী পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে আমি বনানী গোরস্থানে ছুটে যাই। ততক্ষণে সেখানে ১ম সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা ১৮টি কবর খুঁড়ে তৈরি হয়েছিল। আমি যাওয়ার পর শেখ পরিবারের সদস্যদের এভাবে দাফন করতে নির্দেশ দিলাম। (১) বেগম মুজিব, (২) শেখ নাসের, (৩) শেখ কামাল, (৪) মিসেস কামাল, (৫) শেখ জামাল, (৬) মিসেস জামাল, (৭) মাস্টার রাসেল। কবরে তারা এই ধারাবাহিকতায় শায়িত আছেন। ভোর পেরিয়ে সকালবেলার সূর্যছটায় পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত। বাকি লাশগুলো তখনও পৌঁছায়নি দেখে আমি উদ্‌বিগ্ন হলাম। আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম। বাকি লাশ পৌঁছালে আমি তাড়াতাড়ি দাফন করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলাম। অন্যান্য কবরের মধ্যে ১৩নং কবরে শেখ মণি, ১৪নং কবরে বেগম মণি, ১৭নং কবরে শেখ সেরনিয়াবাতকে শায়িত করা হয়।

শেখ সাহেবের লাশ একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো বঙ্গভবনে। আর্মি কোড একটি প্লাটুন মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রস্তুত রাখি। প্রয়াত রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শমসের। তারা তেজগাঁও এয়ারপোর্ট থেকে দুপুর আড়াইটা নাগাদ শেখ সাহেবের লাশ নিয়ে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে আকাশে পাড়ি জমাল। আকাশযানটি টুঙ্গিপাড়া পৌঁছুলে আশপাশের লোকজন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। মেজর মহিউদ্দিন একজন পুলিশের সহায়তায় কোনোক্রমে ১৫/২০ জন লোক জানাজার জন্য জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিল। পিতার কবরের পাশেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হলো।

সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে গিয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার আগেই দাফনকার্য শেষ করে শমসের হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উড়ল। জাতির পিতাকে শেষবিদায় জানাতে টুঙ্গিপাড়ার লোকজন সেদিন ভিড় করেনি। যে ব্যক্তি সারা জীবন বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তার জন্য সংগ্রাম করে গেলেন, তাঁর শেষবিদায় জানানো হলো অতি নীরবে, নিঃশব্দে, অনাড়ম্বরে–সুদূর টুঙ্গিপাড়ার একটি গ্রামে।

লেখক: সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, ১৫ আগস্ট ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক। তিনি ২০০৮ সালের ২৫ জুলাই ইন্তেকাল করেন

ছেলেবেলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার গল্পটা

লুৎফর রহমান রিটন

আমার জীবনের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল আর গৌরবময় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল ছেলেবেলায়। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহ-সান্নিধ্য ও স্পর্শলাভের বিস্ময়কর মুহূর্তগুলোর সমন্বয়েই রচিত হয়েছিল সেই অধ্যায়টি, ১৯৭৪ সালের এক প্রসন্ন বিকেলে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল অবিস্মরণীয় সেই বিকেলের গল্পটির ধারাবাহিক প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছিল ইতিহাসের অলৌকিক প্রণোদনায়।

সময়কাল ১৯৭২। ওয়ারীর আকাশে একাট্টা হয়ে যাওয়া একটা ম্যাজেন্টা রঙের ঘুড়ির পেছনে ছুটতে গিয়ে হেয়ার স্ট্রিট ও র‍্যাংকিন স্ট্রিট ইন্টারসেকশনের কাছে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের হাতে ধরা পড়ার পর দাদাভাই আমাকে সিলভারডেল কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ভেতরে একটা ছবি আঁকার ক্লাসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন একজন শিক্ষার্থী। আমার বয়সি অনেক ছেলেমেয়ে ওখানে ছবি আঁকছিল। ক্লাসে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম হরিদাশ বর্মণকে। দাদাভাই বলেছিলেন–বর্মণ বাবু, আপনার জন্য নতুন একটা ছাত্র নিয়ে এলাম।

প্রথম দিন হরিদাশ বর্মণ স্যার খুব আদর করে আমার হাতে তুলে দিলেন কয়েকটা তুলি আর বড়ো একটা কার্টিজ পেপার। ক্লিপ আঁটা একটা বোর্ডও দিলেন। আর দিলেন চ্যাপ্টা একটা শুভ্র থালা। থালায় নির্দিষ্ট গ্যাপে গ্যাপে প্যালিকেনের ঝকঝকে কৌটা থেকে তুলে দিলেন কিছু লাল, নীল, হলুদ, সাদা আর কালো রং। অতঃপর শুরু হলো আমার ছবি আঁকা। কচিকাঁচার মেলার ছবি আঁকার ক্লাস 'শিল্পবিতান'-এর নিয়মিত ছাত্র হয়ে উঠলাম আমি। ইসলামিয়া মডেল প্রাইমারি স্কুলের খুব নিচের ক্লাসের ছাত্র আমি তখন।

বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারির এক বিকেলে দাদাভাই আমাদের ক্লাসে এসে বললেন, তোমাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকতে হবে। একাত্তরের ছবি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার ছবি। খানসেনা আর ওদের দোসরদের নির্যাতন, নিপীড়ন, অগ্নিকাণ্ড, মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই ও প্রতিরোধের ছবি।

মহোৎসাহে আমরা লেগে পড়লাম মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকায়। কী বিপুল উদ্যম আমাদের! কত ছবি যে আঁকলাম আমরা! হরিদাশ স্যার আমাকে উৎসাহ দেন। আমাকে শিখিয়ে দেন রঙের সঙ্গে রং মিশিয়ে নতুন একটা রং তৈরির ত্বরিত পদ্ধতি। আমার জানা হয়ে যায়–লালের সঙ্গে হলুদ মেশালেই কমলা রঙের আবির্ভাব ঘটে। নীলের সঙ্গে হলুদ মেশালে সবুজ কলাপাতা রং। লালের সঙ্গে সাদা মেশালে গোলাপি। সাদার সঙ্গে কালো মেশালে ধূসর। কালোর সঙ্গে লাল মেশালে চকলেট এবং লাল আর নীল মেশালে বেগুনি। অপরূপ ঝলমলে বর্ণাঢ্য এক পৃথিবীর সন্ধান পেয়ে গেলাম আমি। দাদাভাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী একের পর আঁকলাম মুক্তিযুদ্ধের ছবি।

আমাদের আঁকা ছবিগুলো বড়ো একটা প্যাকেটে ভর্তি করে দাদাভাই এক সন্ধ্যায় (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) আমাদের নিয়ে গেলেন গণভবনে, বঙ্গবন্ধুর কাছে। সেই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে আমি দেখলাম একদম কাছ থেকে, যাকে বলে ছুঁয়ে দেওয়া দূরত্বে। খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের আঁকা ছবিগুলো দেখলেন বঙ্গবন্ধু। কোন? ছবিটা কে এঁকেছে, দাদাভাই সেটা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে।

আমার আঁকা একটা ছবি দেখে বঙ্গবন্ধু খুব অবাক হওয়ার মতো ভঙ্গি করে প্রশ্ন করলেন–'ওওও এটা তুমি এঁকেছো'!

সগর্বে মাথা দোলালাম আমি, হ্যাঁ, আমিই তো আঁকলাম। এই যে ভয়ংকর পাকিস্তানি মিলিটারিরা গ্রামের একটা বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে! পরিবারের বাবাটিকে গুলি করে মেরে ফেলেছে একজন মিলিটারি। উঠানে বাবার লাশ। যুবক ভাইটিকে একজন মিলিটারি বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে! ছোট্ট একটা কোলের শিশুকে রাইফেলের ডগায় বেয়নেটে গেঁথে আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরেছে একজন মিলিটারি। একজন মিলিটারির পা জড়িয়ে মা কাঁদছে। বোনটিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন মিলিটারি। বোনটির গায়ের শাড়ি অর্ধেক খুলে গেছে, বাবার রক্তে বোনটির সাদা রঙের শাড়িটার কিছু অংশ লাল হয়ে গেছে...।

আমার কথাবার্তায় খুব খুশি হয়ে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু আমার গালে আর মাথায় হাত ছুঁয়ে আদর করে দিয়েছিলেন–'বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে তো তোমার আঁকা ছবিটা!'

ছেলেবেলা থেকেই খুব চটপটে ছিলাম বলে বড়োদের সঙ্গে কথা বলতে একটুও ভয় পেতাম না আমি। ভয় পাইনি বঙ্গবন্ধুকেও। আর বঙ্গবন্ধু আমার সঙ্গে এমন আন্তরিকতা মিশিয়ে কথা বলছিলেন যে আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমার অনেক দিনের চেনা।

রাতে ঘটল বিশাল ঘটনা। বিটিভির নিউজে আমাদের দেখাল! সাদাকালো টিভি তখন। দাদাভাই ছাড়াও আমাদের সঙ্গে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী হাশেম খান এবং ডক্টর আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন।

আইডিয়াটা ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের। মাঝেমধ্যেই কচিকাঁচার মেলার ছবি আঁকার ক্লাসে আসতেন তিনি। প্রথমে র‍্যাংকিন স্ট্রিট সিলভারডেল কিন্ডারগার্টেনের ক্যাম্পাসে, পরে জয়কালী মন্দির রোডে কেন্দ্রীয় মেলার ছবি আঁকার ক্লাসে। ইজেলে পিসবোর্ডের ক্লিপে কার্টিজ পেপার সাঁটিয়ে ছবি আঁকতাম আমরা সারিবদ্ধ হয়ে। কতদিন শিল্পাচার্য আমার স্কেচ ঠিক করে দিয়েছেন! ব্রাশে রং মাখানো শিখিয়ে দিয়েছেন! ব্রাশের স্টোক দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন! তো, সেই শিল্পাচার্যই চাইছিলেন আমরা শিশুকিশোররা যেন মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকি। শিল্পাচার্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের আঁকা ছবি থেকে তিনশ ছবি বাছাই করা হলো।

আমাদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনী হয়েছিল জয়কালী মন্দির মেলা ভবনে। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ সেই প্রদর্শনীটি উদ্‌বোধন করেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। (আমাদের আঁকা ৩০০ ছবি থেকে ৭০টি বাছাই করেছিলেন শিল্পাচার্য। সেই ৭০টি ছবি নিয়েই আমরা গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে।)

শিল্পাচার্য বিদেশ সফরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই তার মাথায় আইডিয়াটা এসেছিল। তিনি সঙ্গে করে ছোটোদের আঁকা কিছু মুক্তিযুদ্ধের ছবি নিয়ে যেতে চান। তিনি চান বিশ্ববাসী দেখুক শিশুদের চোখে একাত্তরের ভয়াবহতা। নৃশংসতা। বঙ্গবন্ধুকে তিনি তার পরিকল্পনার কথাটা বলেছিলেন। শুনে বঙ্গবন্ধুও একমত পোষণ করেছিলেন–হ্যাঁ, আমাদের শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো দেখে বিশ্ববাসী বলুক বাংলার মানুষের স্বাধীনতাসংগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য ছিল কি না।

আমাদের আঁকা ছবিগুলো শিল্পাচার্য নিয়ে গেলেন লন্ডনে। লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে ছবিগুলোর প্রদর্শনী হলো ১৯৭২ সালের ২২ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। সেই প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে শিল্পী হাশেম খানের তত্ত্বাবধানে দু-তিন ভাঁজের দৃষ্টিনন্দন একটা ফোল্ডার ছাপা হয়েছিল। সেই ফোল্ডারে আমার আঁকা একটি ছবিও স্থান পেয়েছিল। ছবির ক্যাপশনে খুদে হরফে ছাপা হয়েছিল আঁকিয়ের নাম–রিটন, বয়স ৯ বছর।

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে পরবর্তী সময়ে কানাডাসহ আটটি দেশের আটটি শহরে ছবিগুলোর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিপুলদর্শক সমাগম হয়েছিল সর্বত্র, সবকটি প্রদর্শনীতেই। ওখানকার পত্রপত্রিকায় ছাপা এ সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং বিশেষ প্রতিবেদনের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি। খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল বিদেশের মাটিতে। শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ছবিগুলো রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল মিডিয়াসহ নানা পেশার মানুষের হৃদয়ে। বিবিসিসহ অন্য সংবাদমাধ্যমগুলোও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল অভিনব এই বিষয়টিকে। আমাদের মতো খুদে শিল্পীদের তুলিতে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে হতভম্ব হয়েছিলেন ভিনদেশিরা। আর সেটা অবহিত হয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই কাহিনি আমাদের বলেছিলেন দাদাভাই ও হাশেম খান। পরে দাদাভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, আমাদের আঁকা কয়েকটা ছবি মস্কোতে পাঠানো হয়েছিল উপহার হিসাবে। রাষ্ট্রীয় উপহার।

শিল্পাচার্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের নেতৃত্বে যেদিন সন্ধ্যায় আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, সেদিন রাতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবরে আমাদের দেখিয়েছিল। সাদাকালো টিভিতে বঙ্গবন্ধুর পাশে নিজেকে অবলোকন করে ছোট্ট আমার কি যে আনন্দ, কি যে আনন্দ!

তখন তো আর এখনকার মতো এত প্রাইভেট টিভি চ্যানেল ছিল না। ছিল শুধু একটাই, সবে ধন নীলমণি 'বাংলাদেশ টেলিভিশন'। কোটি কোটি দর্শক ছিল বিটিভির। ন্যাশনাল নিউজের কয়েক সেকেন্ডের ফুটেজ রীতিমতো 'বিখ্যাত' বানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের দৃশ্য আমাকে প্রায় তারকার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

স্কুলে, রাস্তায় চেনা-অচেনা মানুষ আমাকে আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়–আরে! এই ছেলেটাকেই না দেখলাম টিভিতে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে!

গর্বে আমার পা পড়ে না মাটিতে। সেই রাতের টেলিভিশন ছাড়াও পরেরদিন সকালে প্রায় সবকটা দৈনিক পত্রিকার ফ্রন্টপেজে (কোনোটায় শেষের পাতায়) ছাপা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একদল শিশুর একটি

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কার্যালয়ে বসে কচিকাঁচার মেলার খুদে শিল্পীদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি দেখছেন উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে। ছবির ডানে বঙ্গবন্ধুর কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়ানো বালকটি লুৎফর রহমান রিটন। ছবিটি ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাপা হয়েছিল দেশের সবকটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকের প্রথম অথবা শেষের পাতায়

ছবি। বঙ্গবন্ধুর পাশে তাঁর কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি আমি! দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায় ছাপা হওয়া তিন কলাম সাত ইঞ্চি মাপের ছবিটা কেটে রেখে দিয়েছিলাম অনেক যত্ন করে। দৈনিক ইত্তেফাক, অবজারভার, টাইমসেও ছাপা হয়েছিল ছবিটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে। কয়েক বছর পর 'সাপ্তাহিক খবর' প্রকাশিত সৈয়দ আলী নওয়াব রচিত 'আমি রাসেল বলছি' নামের বইয়েও সেই ছবিটা মুদ্রিত হতে দেখেছি। (বইটির পরবর্তী সংস্করণগুলোয় লেখক হিসাবে মিজানুর রহমান মিজানের নাম ছাপা হয়েছে। প্রকাশক নভেল পাবলিশার্স।)

দুই.

১৯৭২ সাল। সদ্যস্বাধীন দেশে যখন আমি কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার ছবি আঁকার ক্লাস 'শিল্প বিতান'-এর শিক্ষার্থী, তখন সবখানেই একটা অন্যরকম আবহ। বাঙালি মধ্যবিত্ত তখন বিকশিত হচ্ছে ভিন্নমাত্রায়। শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমান পরিবারগুলোর দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি সাদাকালো ছবি শোভা পেত। একটি রবীন্দ্রনাথের, অন্যটি নজরুলের। অনেক বাড়ির পাকা দেওয়ালে, টিন অথবা বাঁশের বেড়ার দেওয়ালে শোভা পেত সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কাবার ছবি কিংবা বাংলা নয়তো আরবিতে লেখা 'আল্লাহু'। তাজমহলের ছবিও ঝুলিয়ে রাখত কিছু পরিবার। সেই রকম একটা সময়ে আমি ছবি আঁকা শিখছি কচিকাঁচার মেলার শিল্পবিতানে। স্বপ্ন একটাই–বিরাট শিল্পী হব। গ্রাম, বৃক্ষ, ছনের ঘর, শহুরে দালানবাড়ি, নদী, নৌকা, মানুষ, প্রজাপতি, বেড়াল, হাতি কিংবা পাখির ছবি আঁকতাম বিপুল উদ্যমে। বাদ যেত না রবীন্দ্রনাথ-নজরুলও।

তখন বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনটি ছিল ডিআইটিতে। আমি সেখানে ছোটোদের অনুষ্ঠানে অংশ নিই। উনিশ শ তিয়াত্তরের মার্চে বিটিভিতে একটা অনুষ্ঠান হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে। খুদে আঁকিয়ে হিসাবে আমি তখন মোটামুটি কদর-টদর পাচ্ছি।

একদিন আমাকে বলা হলো শেখ মুজিবের একটা ছবি আঁকতে। তিন-চারদিন টানা পরিশ্রম করে এঁকে ফেললাম শেখ মুজিবের একটা ছবি। তর্জনী উঁচিয়ে ৭ মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন শেখ মুজিব। সামনে অসংখ্য মাথা কিলবিল করছে।

তখন বিটিভিতে যে কোনো অনুষ্ঠানই লাইভ টেলিকাস্ট বা সরাসরি সম্প্রচার হতো। এখনকার মতো রেকর্ডিংয়ের যথেচ্ছ সুযোগ তখন ছিল না। একলা একা আমি তো যেতে পারব না টিভি অফিসে, তাই এক সন্ধ্যায় আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন সাগর ভাই মানে ফরিদুর রেজা সাগর। ছোট্ট একটা স্টুডিয়োতে আমার মতো আরও জনাদশেক ছেলেমেয়েকে বেতের মোড়া ধরনের আলাদা আলাদা আসনে বসানো হয়েছে। প্রত্যেকের সামনে ছোট্ট মাপের ইজেল এবং ইজেলে প্রত্যেকের আঁকা শেখ মুজিবের ছবিটা ক্লিপ দিয়ে সাঁটানো।

নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা সুদর্শন এক ভদ্রলোক উপস্থাপক। কী চমৎকার করেই না কথা বলেন ভদ্রলোক! আমি তো রীতিমতো মুগ্ধ। এত সুন্দর করে কথা বলা যায়!

আমার আঁকা সাদাকালো বঙ্গবন্ধুর ছবিটির খুব প্রশংসা করলেন তিনি। আমি ওটা কী ভাবে এঁকেছি জানতে চাইলেন। বললাম, দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হওয়া ছবি দেখে এঁকেছি।

আমাদের সামনে আলাদা একটা জায়গায় বড়ো ইজেলে সাদা একটা ক্যানভাস ফ্রেম করা। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, তোমার এই ছবিটা আঁকা খুবই সহজ।

শুনে আমি মাথা নাড়ি, না, মোটেও সহজ নয়। এটা আঁকতে তিন-চারদিন লেগেছে আমার।

কিন্তু ভদ্রলোক তবুও বলেন–বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের এই ছবিটা আঁকা

একদম সহজ। বলেই পকেট থেকে কালো একটা চক বের করে ইজেলে রাখা সাদা ক্যানভাসে খুব ক্ষিপ্র গতিতে ১০-১২টা কিংবা ১৫-২০টা আঁক কষলেন। কী আশ্চর্য, এক ঝটকায় ওই আঁকিবুঁকির ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলেন আঙুল উঁচিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব!

বিস্ময়ে আমাদের তো চোখ একেবারে যাকে বলে ছানাবড়া। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! লোকটা ম্যাজিক জানে নাকি? মাত্র কয়েকটা টান দিতেই শেখ মুজিব! আর আমি কিনা তিন-চারদিন ঘষে-মুছে...। কে রে ভাই এই লোকটা?

অনুষ্ঠানের পর সাগর ভাই আমার সঙ্গে সেই লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলেন–মন্টু ভাই, এ হচ্ছে রিটন। কচিকাঁচার মেলার রিটন। আর রিটন, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত মানুষ মুস্তাফা মনোয়ার। খুব বড়ো শিল্পী। আমাদের সবার প্রিয় মন্টু ভাই (সেদিন থেকে মুস্তাফা মনোয়ার আমারও মন্টু ভাই হয়ে গেছেন)।

পরদিন ওয়ারীর রাস্তায়, স্কুলে যাওয়ার পথে বনগ্রাম-বিসিসি রোড-ঠাটারিবাজার এলাকায় এবং ক্লাসে গিয়ে টের পেলাম গতকাল বিটিভিতে প্রচারিত সন্ধ্যার সেই লাইভ অনুষ্ঠানটা অনেকেই দেখেছে! আর এ কারণেই রাস্তায় লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে দ্বিতীয়বার দেখছে আমাকে!

তিন.

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কচিকাঁচার মেলার জাতীয় শিক্ষাশিবির বা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুলিস্তানের পাশে, বঙ্গভবনের উলটাদিকে, শহিদ মতিউর শিশুপার্কে। সারা দেশ থেকে কচিকাঁচার মেলার বিভিন্ন শাখার কয়েক শ কিশোর-কিশোরী সেই ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিল। আমিও অংশ নিয়েছিলাম সেই ক্যাম্পে কেন্দ্রীয় সদস্য হিসাবে।

মতিউর শিশুপার্কে আমরা থাকতাম তাঁবু খাটিয়ে। এই শিবির বা ক্যাম্পে কঠোর অনুশাসনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলত আমাদের নানারকম কর্মকাণ্ড। শরীরচর্চা, প্যারেড-পিটি, ব্রতচারী, বাঁশনৃত্য, লাঠিখেলা, উপস্থিত বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি কত কিছু!

এই ক্যাম্পে ব্রতচারী শিক্ষক হিসাবে কুষ্টিয়ার বিখ্যাত 'ওস্তাদ ভাই'কে পেয়েছিলাম আমরা। বয়সে প্রবীণ; কিন্তু শারীরিকভাবে শক্তিমান নবীন ছিলেন তিনি। ধনুকের ছিলার মতো টানটান শরীরের ওস্তাদ ভাই শেখাতেন লাঠিখেলা। ডানে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে বিদ্যুৎ গতিতে লাঠি চালিয়ে শত্রুকে কুপোকাত করার কৌশল শিখেছিলাম তার কাছ থেকে। কী বিস্ময়কর দ্রুততায়ই না লাঠি চালাতেন সেই বৃদ্ধ! একাই লড়তেন চার-চারজন লাঠিধারীর সঙ্গে! ওস্তাদ ভাইয়ের কাছেই শিখেছিলাম ব্রতচারী নৃত্য এবং সেই 'নৃত্যের সঙ্গে গীত' অনবদ্য কিছু গান–ইয়া জসোবা-ইয়া জসোবা গুরুজি ইয়া জসোবা/অবাক করে গুরুজি তব মানব সেবা/রায়বেশে কাঠি সারি ঢালি ঝুমুর ঝারি/তাই গেয়ে প্রণাম জানাই যত ব্রতচারী/...('ইয়া' একটি রিদমসমৃদ্ধ ধ্বনি এবং জসোবা হচ্ছে 'জয় সোনার বাংলা'র সংক্ষিপ্ত রূপ)। শিখেছিলাম–মায়ের জাতের মুক্তি দে রে/ যাত্রাপথের বিজয় রথে চক্র তোদের ঠেলবে কে রে?/ মায়ের জাতের মুক্ত প্রভাব/ গড়বে তোদের বীরের স্বভাব/ বিশ্ব সভার উচ্চাসনে চড়বে না কেউ তোদের ছেড়ে/...।

ক্যাম্পে আমাদের প্রত্যেকের বুকে একটা ব্যাজ ও সংখ্যা লেখা একটা স্টিকার সাঁটানো থাকত। আমার সংখ্যাটি ছিল সম্ভবত ২৮০। এই সংখ্যাটির মাধ্যমেই আমাদের আইডেন্টিফাই করা হতো। আমাদের সারাদিনের কর্মকাণ্ড, আচরণ প্রভৃতি গোপনে লক্ষ রাখতেন সিনিয়ররা অর্থাৎ সাথী ভাইয়েরা। সাথী ভাইয়েরা আমাদের কীভাবে খেয়াল রাখতেন, সেটা আমরা টেরও পেতাম না। প্রতিদিন আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আচরণ ও সাফল্য-ব্যর্থতা অনুযায়ী তারা নম্বর দিতেন (তাদের নোটবইয়ে টুকে রাখতেন)। সেই নম্বরগুলো যোগ করে মেলার সমাপ্তিতে তিনটি ক্যাটগরিতে আমাদের কয়েকজনকে খেতাবে ভূষিত করে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পের সর্বোচ্চ খেতাব 'দলমণি' অর্জন করেছিলাম আমি।

দাদাভাই বলেছিলেন, ক্যাম্পের সমাপ্তিপূর্বে কোনো একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসবেন আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে অথবা দাদাভাই আমাদের নিয়ে যাবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করেছি–কবে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! কখন দেখব তাঁকে সামনাসামনি!

আমাদের ক্যাম্পের তাঁবুবাসের শেষদিকে এক মনোরম বিকেলে অনেক বাস বোঝাই হয়ে আমরা গিয়েছিলাম গণভবনে, বঙ্গবন্ধুর কাছে। ১৯৭২-এর পর সেটা ছিল আমার ছুঁয়ে দেওয়া দূরত্ব থেকে দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধু দর্শন।

সেদিনের সেই বিকালটা খুবই মনোরম ছিল। উজ্জ্বল সোনালি রোদের আভায় ভীষণ চকচকে ছিল। আমাদের পেয়ে কীরকম উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু! সহসা বঙ্গবন্ধু দাদাভাইকে বললেন, আসেন দাদাভাই আপনার সঙ্গে একটু ব্রতচারী হয়ে যাক। তারপর ঝাউর গিজার গিজঘিনিতা/ ঝাউর গিজার গিজঘিনিতা/এক ধামা চাল একটা পটোল/এক ধামা চাল একটা পটোল–বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু নির্দিষ্ট একটা রিদমে ব্রতচারীর একটা মুদ্রা এমন চমৎকার নিখুঁত দেহভঙ্গিতে আমাদের দেখালেন যে হাততালিতে মুখর হয়ে উঠলাম আমরা। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য! বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ব্রতচারী নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন দাদাভাইও।

দাদাভাই আর বঙ্গবন্ধুর যৌথ ব্রতচারী নৃত্যের অবিস্মরণীয় সেই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন কোনো আলোকচিত্রী। যদিও সেই আলোকচিত্র আমার দেখা হয়নি।

সেই বিকালে আমাদের নিজস্ব কিছু আনুষ্ঠানিকতাও ছিল। আমার নেতৃত্বে মার্চপাস্ট হলো। মার্চপাস্টে ছেলেমেয়েদের স্যালুট গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। মার্চপাস্টের শুরুতে ছোট্ট এইটুকুন আমি বিশাল দেহের বঙ্গবন্ধুর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলাম কচিকাঁচার মেলার ক্যাপ।

খুব নিচু হয়ে মাথাটা আমার নাগালের কাছে নামিয়ে এনে বিরাট-বিশাল বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করলেন আমার মতো একজন খুদে বন্ধুর স্মারক উপহার। বঙ্গবন্ধুর মাথা এবং মাথার চুল স্পর্শ করতে হলো আমাকে, ক্যাপটা তাঁকে পরাতে গিয়ে। তাঁর শক্ত এবং ঘন কালো চুলগুলো খুব ঠান্ডা ছিল।

(কারও মাথার চুল এত ঠান্ডা হয়! আমাদের কাছে আসার আগ পর্যন্ত সারাটা দিন একটানা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ছিলেন বলেই কি তাঁর সতেজ ঘন চুলগুলো এত শীতল লাগছিল আমার কাছে! কী জানি! তাঁর শরীর থেকে, সাদা পাঞ্জাবি আর কালো মুজিবকোট থেকে মিষ্টি একটা সৌরভ যেন ছড়িয়ে পড়ছিল। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পারফিউমের নামটা আমার জানা নেই। তিনি তাঁর বিখ্যাত পাইপে এরিনমোর তামাক খেতেন। মিষ্টি সুবাসটা কি তাহলে এরিনমোরের গন্ধ ছিল! কী জানি!)

মাথায় ক্যাপটা পরানোর পর বঙ্গবন্ধু হ্যান্ডশেক করলেন আমার সঙ্গে। আহা কী নরম তাঁর হাতটা! তারপর তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত তর্জনীটি, একাত্তরের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের চিরস্মরণীয় সেই আঙুলটি আমার দিকে তাক করে খুবই হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে বললেন, আরে এই ছেলেটাকে তো মনে হয় চিনি আমি!

আমি আমার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে তাঁর হাতটা জড়িয়ে ধরলাম, হ্যাঁ, চেনেন তো! আমি রিটন। ছবি আঁকি। আমাদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলাম তো!

বঙ্গবন্ধু বললেন, আরে তাই তো। এইটাই তো সেই আর্টিস্ট ছেলেটা। খুব সুন্দর ছবি আঁকে! হাসিমুখে দাদাভাই বললেন, আমাদের

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণভবনে কচিকাঁচার মেলার ভাইবোনদের মার্চপাস্টের স্যালুট নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর বাঁ পাশে কবি সুফিয়া কামাল এবং রোকনুজ্জামান খান দাদাভাইয়ের মাঝখানে বালক লুৎফর রহমান রিটন

রিটন ছড়াও লেখে! ইত্তেফাকে ওর ছড়া ছাপাও হয়েছে!

শুনে বঙ্গবন্ধু একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, তাই নাকি? তুমি তাহলে কবি হবা বড়ো হয়ে! সুফিয়া কামালের মতো? জসীমউদ্‌দীনের মতো?

আমি না-সূচক মাথা নাড়াই, না বঙ্গবন্ধু, আমি কবি হব না। বঙ্গবন্ধু বললেন, তাহলে তুমি হবা ছড়াকার।

এবারও রাজি হই না আমি। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাই। আমার কাণ্ড দেখে দাদাভাই আর খালাম্মা সুফিয়া কামাল হাসতে থাকেন। আমার কথায় মজা পেয়ে হাততালি দিতে থাকেন সুফিয়া কামাল।

এবার বঙ্গবন্ধু বললেন, তাহলে বড়ো হয়ে কী হবা তুমি?

খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে বললাম, আমি,

–আর্টিস্ট হব।

–কত বড়ো আর্টিস্ট হবা?

–জয়নুল আবেদীনের মতো বড়ো আর্টিস্ট হব বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু বললেন, বাহ, আমাদের তাহলে দুইটা জয়নুল আবেদিন হবে!

আমাদের কথোপকথনের সময় পাশে থাকা কবি সুফিয়া কামাল আর রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই খুব হাসছিলেন। আসলে ছেলেবেলা থেকেই খুব চটপটে আর ছটফটে স্বভাবের ছিলাম আমি। বড়োদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতাম না একটুও। এবং ভয় পাইনি বঙ্গবন্ধুকেও। আর বঙ্গবন্ধু আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিলেন যে আমাকে তিনি অনেক আগে থেকেই চেনেন! এই প্রথম আমাদের দেখা হচ্ছে না। এর আগেও দেখা হয়েছে বহুবার, এতটাই পরিচিত আমি তাঁর কাছে।

আমার মাথায়, কাঁধে, গালে আর চিবুকে আলতো করে আঙুল ছুঁয়ে আদর করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এই অপরূপ কথোপকথন আমার একজীবনের শ্রেষ্ঠ সংলাপের স্মৃতি হয়ে থাকল। এই সৌভাগ্যের কথা, এই পরম প্রাপ্তির কথা আমি গৌরবের সঙ্গে উচ্চারণ করে যাব নতুন প্রজন্মের কাছে। সেই বিকেলটা, সেই মুহূর্তগুলো, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁকে ছুঁয়ে দেওয়া এবং তাঁর অনন্য আশীর্বাদমাখা স্নেহস্পর্শ পাওয়ার সেই অমূল্য ঘটনাটা এখনো আমার কাছে অলৌকিক কোনো রূপকথা বলেই মনে হয়! এরকম মুহূর্ত একবারই আসে ইতিহাসে, মানবজীবনে।

চার.

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতের এই ঘটনার একটাই স্টিল ছবি পেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু স্যালুট নিচ্ছেন কচিকাঁচার মেলার ভাইবোনদের। তাঁর বাঁ পাশে কবি বেগম সুফিয়া কামাল আর দাদাভাইয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি আমি সেদিনের ছোট্ট বালক লুৎফর রহমান রিটন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতের ঘটনাটা বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবর ছাড়াও সিনেমা হলগুলোয় দেখানো হয়েছিল। সে আরেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল আমার জীবনে।

তখন বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলোয় সিনেমা শুরু হওয়ার আগে 'চিত্রে বাংলাদেশের খবর' নামে একটা সেগমেন্ট প্রচারিত হতো। বঙ্গবন্ধুর মাথায় আমি কচিকাঁচার মেলার ক্যাপ পরিয়ে দিচ্ছি, তিনি নিচু হয়ে ঝুঁকে আমাকে সহায়তা করছেন, ক্লোজ শটে এই দৃশ্যটি 'চিত্রে বাংলাদেশের খবরে' বহুদিন ধরে দেখানো হয়েছিল। গমগমে ভরাট হিরণ্ময় কণ্ঠে সেই খবর পাঠ করেছিলেন বিখ্যাত সংবাদ পাঠক সরকার কবির উদ্দিন। মধুমিতা সিনেমা হলের বিরাট পর্দায় সেই দৃশ্য আমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন অগ্রজ এটিএম মিজানুর রহমান। আহা কী মধুর সেই দৃশ্য! কয়েক সেকেন্ডের সেই দৃশ্যটা দেখার জন্য সিনেমার দুটি টিকিট কিনতে হয়েছিল আমার অগ্রজকে। বাড়তি পাওনা হিসাবে সেদিন কোন সিনেমাটা দেখেছিলাম সেটা আজ মনে নেই। তবে সিনেমা হলের বিশাল বড়ো পর্দায় সাদাকালো ঝকঝকে চলমান ছবিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নিজেকে অবলোকনের সেই স্মৃতিটা আমার মস্তিষ্কে মুদ্রিত হয়ে থাকল স্থায়ীভাবে।

পাঁচ.

সে বছর ১০ জুলাই আমি বার্লিন গেলাম।

পূর্ব জার্মানির রাজধানী তখন বার্লিন। জার্মানি তখন দুই ভাগে বিভক্ত–পূর্ব আর পশ্চিম। পশ্চিম জার্মানি ধনতান্ত্রিক দেশ আর পূর্ব জার্মানি সমাজতান্ত্রিক। বার্লিনে অনুষ্ঠেয় ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে বাংলাদেশের শিশু প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসাবে আমার সেই বার্লিনযাত্রা। সেই প্রতিনিধিদলে কচিকাঁচার মেলার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম আমিসহ তিনজন–ঢাকার মেয়ে ইশরাত নিগাহ্ বোখারী শাকিলা এবং কুমিল্লার মেয়ে শুক্লা রায় আর আমি লুৎফর রহমান রিটন। খেলাঘর থেকে নির্বাচিত হয়েছিল তিনজন–ঢাকার মেয়ে তাহমিনা সুলতানা স্বাতী (ছাত্রনেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের ছোটো বোন) এবং প্রয়াত মিতা হক (সংগীতজ্ঞ)। আমাদের দলের নেতৃত্বে ছিলেন খেলাঘরের পান্না কায়সার (শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী)। ছয় সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলে আমিই একমাত্র ছেলে। বাকি সবাই মেয়ে! (সেই মেয়েদের একজন মিতা হকই পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রসংগীতের অনেক বড়ো শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।)

কুড়ি-পঁচিশটা দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল বার্লিনের সেই ফেস্টিভ্যালে। বার্লিনে আমরা কুড়িদিন ছিলাম। এক বিকেলে একটা স্টেডিয়ামে আমাদের পারফরম্যান্স ছিল। বিশাল স্টেডিয়ামভর্তি অগুনতি মানুষের উপস্থিতিতে আমার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা একটি ছড়াগান গেয়েছিলো–রেল চলে ঝিকঝিক/ঝিকঝিক ঝিকঝিক/চলছে তো চলছে চলছে/হুঁইশেল বাজিয়ে যাত্রীকে ডাকছে/ঘুম থেকে উঠতে সে বলছে/....।

খুব ভালো হুঁইশেল দিতে পারতাম আমি। রেলের হুঁইশেল। গানটির মাঝখানে বারকয় আমি সেই হুঁইশেলটা দিতাম প্রাণপণে। বার্লিন ক্যাম্পে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই গানটা। বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখলেই 'ঝিকঝিক ঝিক?ঝিক?' বলে উল্লাস প্রকাশ করত। গানটির সুর আর রিদম সম্ভবত মুগ্ধ করেছিল ওদের। স্টেডিয়ামেও আমাদের সঙ্গে 'ঝিক?ঝিক ঝিক?ঝিক?' করছিল ছেলেমেয়েরা। আমার হুঁইশেলটাও বিপুল করতালি কুড়িয়েছিল সেদিন।

বার্লিনের অনুষ্ঠানমালায় একটা দিন ছিল একেবারেই অন্যরকম। আগে থেকেই ঘোষণা দেওয়া সেই দিনটা ছিল সবকটা দেশের ছেলেমেয়েদের জাতীয় পোশাক পরার দিন। পান্না ভাবিসহ দলের মেয়েরা সবাই পরল সুন্দর সুন্দর শাড়ি। কী যে সুন্দর লাগছিল মেয়েগুলোকে! ফিরোজা রঙের ঝলমলে একটা শাড়ি পরেছিলেন পান্না কায়সার। অসম্ভব রূপসী ছিলেন তিনি। তাকে পরির মতো লাগছিল। সেদিন বিকেলের সেই অনুষ্ঠানে মিডিয়ার দৃষ্টি কেড়েছিল আমাদের মেয়েরা, সবকটা দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল ঈর্ষা জাগিয়ে। সেদিন, সব ক্যামেরাম্যান মানে ফটোসাংবাদিকরা ঝাঁক বেঁধে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে অবিরাম শাটার টিপে যাচ্ছিলেন বাংলাদেশের শাড়ি পরা মেয়েদের তাক করে।

বাংলাদেশের মেয়েদের না হয় জাতীয় পোশাক শাড়ি। কিন্তু ছেলেদের? আমি কি লুঙ্গিটুঙ্গি পরে নেমে পড়ব মাঠে?

না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি হাজির হলাম সেখানে, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিবকোট পরে। মুহূর্তেই বেধে গেল হুলুস্থুল কাণ্ড! ফটোসাংবাদিকরা এবার একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর। অবিরাম শাটার টিপছেন তাঁরা। ফ্লাশগানের আলোয় ভেসে যাচ্ছি আমি! শেষ বিকেলের যাই যাই রোদের আবছা আলো-আঁধারির অপরূপ বিভায় সে এক স্বর্ণালি সময়ের বর্ণালি মুহূর্ত! বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের নেতারা ছুটে এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে মহাবিস্ময়ে উচ্চারণ করলেন–'শ্যাক্ মুজিবুর রক্মান, ব্যাঙ্গালাডেস...! (শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ...)।

ফটোসাংবাদিকরাও আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন–'হ্যাল্লো শ্যাক্? মুজিবুর রক্মান!' (হ্যালো শেখ মুজিবুর রহ?মান)।

আমার খুশি দেখে কে! খুশিতে প্রায় লাফাচ্ছি আমি।

সদ্যস্বাধীন একটি দেশের মহান স্থপতিকে, আমাদের বঙ্গবন্ধুকে, আমাদের শেখ মুজিবুর রহমানকে পৃথিবীর সবাই চেনে! তাঁর নাম, তাঁর ফটোগ্রাফ এমনকি তাঁর পোশাকটি পর্যন্ত পরিচিত বিশ্ববাসীর কাছে! ওরকম সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে হাফ স্লিভ কালো কোট পৃথিবীতে একজন নেতাই পরেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর পোশাকটাই ট্রেডমার্ক পৃথিবীর মানুষের কাছে। আর তাই তো বঙ্গবন্ধুর পোশাকে আমাকে দেখেই চারপাশের লোকজন উল্লাসে ফেটে পড়েছে–'হ্যাল্লো শ্যাক্? মুজিবুর রক্মান!' (হ্যালো, শেখ মুজিবুর রহমান)।

সেদিন রাতে বার্লিনের টিভি নিউজে আমাদের দেখিয়েছিল। টিভি পর্দায় নিজের চলমান রঙিন ছবি দেখার অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম। এর আগে কালার টিভি দেখিনি আমি।

পরদিন বার্লিনের বেশ কয়েকটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিবকোট পরিহিত খুদে এক বঙ্গবন্ধুর ছবি! ছবির ক্যাপশনে এমনটাই বলা হয়েছিল। আমাদের এন্ট্রাপ্রেনার জার্মান তরুণী ডাচ ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার ক্যাপশন অনুবাদ করে শুনিয়েছিল আমাকে। একটা পেপার কাটিংস তিনি নিয়েও এসেছিলেন আমাকে দেবেন বলে।

আজ ৪৭ বছর পর আমার স্মৃতির অ্যালবামের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য পাতাটির দিকে চোখ রাখতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে জাতীয় পোশাক পরার সেই বিশেষ দিনটিতে, বার্লিনে, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে মুজিবকোট পরে, কাকতালীয়ভাবে, মনের অজান্তেই আমাদের জাতীয় পোশাকহীনতার বিষয়টিকে আড়াল করতে সক্ষম হয়েছিলাম। (পোশাকের আইডিয়াটা ছিল আমার বাবার। তিনিই আমাকে দর্জির কাছে নিয়ে গিয়ে বানিয়ে দিয়েছিলেন পোশাকটা।) অথচ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের কোনো 'জাতীয় পোশাক' নেই!

ছয়.

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি ভিডিয়ো ফুটেজ পাওয়া গেছে। সেই ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যাচ্ছে বিশাল দেহের বঙ্গবন্ধু তাঁর মাথাটা নিচু করে আমার নাগালের মধ্যে এনে দিচ্ছেন আর আমি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিচ্ছি ক্যাপ, কচিকাঁচার মেলার। তিনি আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। তাঁর বিখ্যাত তর্জনীটি আমার দিকে তাক করে কথা বলছেন হাস্যোজ্জ্বল মুখে। ছোট্ট বালক আমি একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে খুব হাসিখুশি ভঙ্গিতে কথা বলছি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে, আই কন্ট্যাক্টে! আমাদের কথোপকথন শুনে হাসছেন রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই এবং কবি সুফিয়া কামালও। অপরূপ হাসিমুখে সুফিয়া কামাল হাততালি দিচ্ছেন আমার আর বঙ্গবন্ধুর কথাবার্তা শুনে। সব মিলিয়ে একটা অসাধারণ ফ্রেম। সেই ফ্রেমে বঙ্গবন্ধুসহ আমরা সবাই হাস্যোজ্জ্বল।

আহা কী গৌরবসঞ্চারী একটা দৃশ্য! আমার সারা জীবনের এক অনন্য প্রাপ্তি সেই বিকেল এবং সেই বিকেলের এই ভিডিয়ো ফুটেজটি। (বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কুমার বিশ্বজিতের একটি গানে এই ফুটেজটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রচারিত হয়েছে চ্যানেল আইয়ে। গানটাও হয়েছে অসাধারণ, কথায় সুরে আর গায়কীতে)।

সাতচল্লিশ বছর আগের, ১৯৭৪ সালের এই দুষ্প্রাপ্য ভিডিয়ো ফুটেজটির খবর প্রথম আমাকে দিয়েছিল চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠান প্রযোজক শওকত আলী। ২০২০ সালে একুশের বইমেলা উপলক্ষ্যে আমি তখন ঢাকায়। জানুয়ারির শেষান্তে এক দুপুরে চ্যানেল আই ভবনে আমাকে পেয়েই নোয়াখালীর আঞ্চলিক এক্সেন্টে মহা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল শওকত।

–আম্নের লগে বঙ্গবন্ধুর স্টিল ফটোগ্রাফি আম্নের লেখায় এর বইতে দেইখছি এতদিন। বঙ্গবন্ধু স্যালুট নিতেছেন আর ছোট্ট পিচ্চি আম্নে কবি সুফিয়া কামাল-দাদাভাইয়ের লগে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ঘটনার ভিডিয়ো দেইখছেন্নি?

আমি বললাম, না তো! ভিডিয়ো তো দেখিনি!

–আঁই দেইখচি! বঙ্গবন্ধুরে লই কুমার বিশ্বজিতের একটা গান এডিটিং চইলতেছিল। আমি আম্নেরে চিনি ফালাই চিৎকার কইচ্ছি। হ্যার পর রিওয়াইন্ড ফরোয়ার্ড করি সবতে মিলি আমরা আম্নেরে দেইখচি!

আরে তাই নাকি? এই ভিডিয়ো ফুটেজ কোত্থেকে আবিষ্কৃত হলো? মনে হয় ডিএফপিতে ছিল। সাতচল্লিশ বছর পর পাওয়া গেছে!

সাগর ভাইকে বললাম ঘটনাটা। সাগর ভাই তখনও প্রচার না হওয়া গানটা আনিয়ে তাঁর কক্ষে বসে দেখলেন। আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চলমান দৃশ্যটা পর্দায় ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাগর ভাই বলে উঠলেন–অই যে রিটন!

হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত তর্জনীটি বালক রিটনের দিকে তাক করে কথা বলছেন। তাঁদের কথোপকথন শুনে হাসছেন রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ও কবি সুফিয়া কামাল। এক ফ্রেমে বঙ্গবন্ধুসহ সবাই হাস্যোজ্জ্বল

অন্যদের সঙ্গে বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌস আরাও ছিলেন সেখানে। তিনিও অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। সাগর ভাই চ্যানেল আইয়ের কর্মী আইটি বিশেষজ্ঞ সাব্বিরকে বললেন চলমান ছবি থেকে ফ্রিজ করে করে কয়েকটা স্থিরচিত্র আমাকে দেওয়ার জন্যে। বেশ কয়েকটা অসাধারণ স্থিরচিত্রও পেয়ে গেলাম আমি সাগর ভাইয়ের কল্যাণে।

সাত.

আমার জীবনের গতি-প্রকৃতি পালটে দিতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার বিস্ময়কর সেই বিকেলের বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে। যেটা আমি তখনও বুঝিনি, বোঝার কথাও না; কিন্তু এখন বুঝতে পারি।

ছেলেবেলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন তো আমার স্বপ্ন ছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার। কিন্তু নিয়তি বা প্রকৃতি চাইছিল ভিন্নকিছু। তিনি যখন আমার মাথায় চুলে গালে কপালে কাঁধে চিবুকে স্পর্শ করে করে আদর করে দিচ্ছিলেন, তখনই আসলে ঘটে যাচ্ছে অদ্ভুত একটা শিহরণ। বিপুল একটা আলোড়ন। বঙ্গবন্ধুর মতো বিরাট বিশাল হিমালয়সম মানুষটার অলৌকিক সান্নিধ্য আমার ভেতরে কিছু একটা ওলটপালট তো ঘটিয়েই থাকবে। কিন্তু সেটা বোঝার মতো বয়স তখন আমার ছিল না। আমি বুঝিওনি। কিন্তু তিনি তো পরশ পাথরের মতো! তাঁর অবিনাশী স্পর্শের জাদুতে নিয়তি তখনই সিদ্ধান্তটা পাকাপাকি করে ফেলেছিল যে বড়ো হয়ে আমাকে হতে হবে লেখক। হতে হবে কবি। এবং আমার লেখার বিষয় হবেন এই বঙ্গবন্ধু। এবং পরবর্তী সারাটা জীবন আমাকে লিখে যেতে হবে ছড়া কিংবা কবিতা, একের পর এক, তাঁকে নিয়ে। ধারাবাহিকভাবে আমাকে লিখতে হবে বই, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। একের পর এক। একটা বই দুটো বই। সাতটা আটটা দশটা বই।

আমি যখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখি, তখন একটা ঘোরের মধ্যে থাকি। কেমন একটা স্বপ্ন-বাস্তবতার মাঝামাঝি জায়গায়। অদ্ভুত এক জাদু বাস্তবতায়। যেন আমি লিখি না। আমি লিখছি না। প্রকৃতিই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে যেন!

শৈশবে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য স্মৃতি আমার মনোজগতে চিরস্থায়ী একটা ছাপ ফেলে দিয়েছিল। তাঁর স্পর্শের সৌরভ আর সান্নিধ্যের গৌরব দীপান্বিত করেছিল আমাকে। সেই বৈভব আমি বহন করে চলেছি আজও। আমার করোটির চিরহরিৎ অলিন্দে থাকা, হৃদয়ের গভীর গোপন কুঠুরিতে থাকা একজন মুজিব প্রায়ই ছন্দ হয়ে হাসেন এবং ছড়া হয়ে আসেন। প্রকৃতি এক অদ্ভুত খেলা খেলে আমার সঙ্গে। একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে যেন বা প্রকৃতিই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় শেখ মুজিবের ছড়া। আর সেটা মুদ্রিত হয় আমার নামে, লুৎফর রহমান রিটনের নামে–'কান পেতে শোনো এই বাংলার মাটি বায়ু নদী সরোবর/জপিতেছে নাম করিয়া প্রণাম মুজিবর আহা মুজিবর...।'

আট.

কবি সুনীল গঙ্গোপধ্যায় তাঁর একটি প্রেমের কবিতায় বলেছিলেন–
'এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি?'

সুনীলের সেই কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো আমিও বলতে পারি দ্বিধাহীন চিত্তে–
বিরাট বিশাল অভ্রভেদী বঙ্গবন্ধু
তাঁর চিরউন্নত শিরটি একবারই নামিয়ে এনেছিলেন একজন শিশুর হাতের নাগালে,
সেই শিশুটি আমি।
অবলীলায় আমি ছুঁয়েছি তাঁর সাতই মার্চের অমর সেই তর্জনীটি।
যেই তর্জনীর ঐতিহাসিক হেলনেই নির্মিত হয়েছিল
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নিজস্ব মানচিত্র ও পতাকা।
অতঃপর অলৌকিক সেই বিকেলে
বঙ্গবন্ধুর হাত ছুঁয়েছে আমার কপোল-চিবুক,
স্পর্শ করেছে আমার কাঁধ,
তাঁর জাদুকরী আশীর্বাদের হাতটি তিনি রেখেছিলেন অপাপবিদ্ধ বালক আমার ছোট্ট এইটুকুন মাথায়,
বঙ্গবন্ধুর অলৌকিক স্পর্শ লাগা আমার শরীর-মন-মেধা-মনন কি কোনো পাপ করতে পারে?

অটোয়া, ১৫ মার্চ ২০২১

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

চট্টগ্রামের প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চায় বঙ্গবন্ধু

কুমার প্রীতীশ বল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের বটবৃক্ষের নিচে একদা আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতাকামী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি জাতি জীবনচর্চা শুরু করেছিল। আকস্মিকভাবে হন্তারক দল তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। গোটা দুনিয়া শোকাহত হয়ে পড়ে। কিন্তু শোককে শক্তিতে পরিণত করে প্রতিবাদের ঝড় তুলতেও সময় লাগেনি। চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কারণ, চট্টগ্রামের প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর একটি আলাদা মমত্ববোধ ছিল। বিশ্বাসও ছিল। তিনি জটিল এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চট্টগ্রাম থেকে শুরু করতেন। ছয় দফা আন্দোলন কিংবা পরবর্তীকালের স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণে চট্টগ্রামের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাই ভাবতে ভালো লাগে, পঁচাত্তর-পরবর্তী নিষিদ্ধ সময়ে এবং সাম্প্রতিককালের মুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রতিবাদী ইতিহাস রচনায় চট্টগ্রাম অনন্য ভূমিকা পালন করে। যখন বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, তখনও প্রকাশ্যে স্বনামে হাতে সরব ছিলেন চট্টগ্রামের একদল লেখক।

দুই.

১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম বার্ষিকীতে জেগে উঠেছিল চট্টগ্রাম। জাতির পিতা হত্যার অন্যতম প্রতিবাদী লেখক কবি মিনার মনসুর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "...অভিনব এক আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে আসেন বিশ্ববিদ্যারয়ে পড়ুয়া আমাদের এক বড় ভাই। তাঁর নাম খোরশেদ আলম সুজন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম বার্ষিকীতে (১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট) প্রকাশিত হয় ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত একটি গানের পঙ্‌ক্তি নিয়ে এক পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র। সেই পঙ্‌ক্তিগুলো হলো: 'বলো কী তোমার ক্ষতি/জীবনের অথৈ নদী/পার হয় তোমাকে ধরে/দুর্বল মানুষ যদি।' প্রচারপত্রের অর্ধেকটাজুড়ে কাঠের ব্লকে মুদ্রিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ একটি ছবি। এর নিচে ৩৬ পয়েন্ট টাইপে পঙ্‌ক্তিগুলো ছাপা হয়েছিল। গোপনে বিলি করা প্রচারপত্রটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।"

১৯৭৮ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার তৃতীয় বার্ষিকীতে কবি মিনার মনসুর এবং কবি দিলওয়ার চৌধুরী দুই বন্ধুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'এপিটাফ' নামে ৪০ পৃষ্ঠার একটি সংকলন, যেখানে প্রতিটি লেখা ছিল জাতির পিতাকে নিবেদিত। এখানে উল্লেখ্য, 'এপিটাফ নামের আক্ষরিক অর্থ তো বটেই, এমনকি এই নামকরণের অন্তর্গত তাগিদও ছিল বঙ্গবন্ধুর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ। এই প্রেক্ষাপটেই এপিটাফ প্রকাশনীর উদ্ভব।' এর পরের বছর (১৯৯৭ সালে) কবি মিনার মনসুর এবং কবি দিলওয়ার চৌধুরীর সম্পাদনায় এপিটাফ প্রকাশনীর ব্যানারে প্রকাশিত হলো 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ'। বঙ্গবন্ধু হত্যার চার বছরের মাথায় ১০টি প্রবন্ধ এবং ২৫টি কবিতা নিয়ে ১২১ পৃষ্ঠার একটি সংকলন প্রকাশ করা ছিল সত্যিকারার্থে দুঃসাহসিক কাজ। কারণ, তখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখি করার মতো বিবেকবান সাহসী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। উল্লেখ্য, এই দুঃসাহসিকতাকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা একাডেমি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' সংকলনটি হুবহু ২০২০ সালে পুনঃপ্রকাশ করে। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত সংকলনটির দুঃসাহসিক লেখকরা হলেন ড. মযহারুল ইসলাম, ড. আবদুল মতিন চৌধুরী, ড. কবীর চৌধুরী, ইসমাইল মোহাম্মদ, সন্তোষ গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, জাহিদুল হক, ওমর আলী, শাহাদাত বুলবুল, ফজলুল হক সরকার, শামসুল আলম সাঈদ, খালিদ আহসান, কামাল চৌধুরী, মিনার মনসুর, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবসার হাবীব, জাফর ওয়াজেদ, দিলওয়ার চৌধুরী, আলমগীর রেজা চৌধুরী, হারুন রশিদ, নাজিম হাসান, সুজাউদ্দিন কায়সার, বিনতা শাহীন, সনজীব বড়ুয়া, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, ইকবাল করিম, স্বপন দত্ত, শিশির দত্ত, খোরশেদ আলম সুজন, ইসরাইল খান ও জমীর চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম প্রতিবাদী গল্প রচিত হয় চট্টগ্রামে। 'মৃতের আত্মহত্যা' নামের গল্পটি কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল তার শেষ বয়সে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসনের সময় সবরকম বাক্‌স্বাধীনতা রুদ্ধ করা পরিবেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে রচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, আবুল ফজল জিয়াউর রহমানের বারবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি শর্তে, যার অন্যতম বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, জিয়াউর রহমানের সম্মতি নিয়ে তার উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেন। যোগ দেওয়ার পরপরই তিনি তার দেওয়া শর্ত বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে সুযোগ পেলেই জিয়াকে প্রশ্ন করতেন। বেশ কিছুদিন পরও যখন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কোনো অগ্রগতি দেখতে পেলেন না, তখন তিনি গল্পের আবরণে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না করার প্রতিবাদ জানিয়ে এ গল্পটি লিখে 'সমকাল' ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য দেন। সমকালের সেই সংখ্যার সব কপি ছাপা সম্পন্ন হলে ভোরেই জিয়ার নির্দেশে পুলিশ ছাপাখানা থেকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য ওই ইস্যুটি গোপনে অনেক কপি হয়ে সুধী সমাজের হাতে চলে যায়।' (মৃতের আত্মহত্যা গল্প গ্রন্থের ভূমিকাংশ)। আগামী প্রকাশনী থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত মৃতের আত্মহত্যা নামের গল্প সংকলনটিতে আবুল ফজলের রচিত বঙ্গবন্ধু হত্যার ওপর আরও তিনটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছে। 'মৃতের আত্মহত্যা' গল্পটির নাট্যরূপও হয়েছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন লেখককন্যা অধ্যাপক মমতাজ লতিফ। 'শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি' নামের স্মৃতিকথাটি আবুল ফজলের আরেকটি সাহসী কাজ। এটি ধারাবাহিকভাবে ১৯৭৭ সালে সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে মুজিবাদর্শের মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে মুক্তিবাণী প্রকাশন এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। ২০১৬ সালে চট্টগ্রামের বাতিঘর প্রকাশন নবতর সংস্করণ প্রকাশ করে। আবুল ফজলের আরেকটি গ্রন্থ হলো 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ'।

১৯৮০ সালে এপিটাফ প্রকাশনীর ব্যানারে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হলো কবি মিনার মনসুর এবং কবি দিলওয়ার চৌধুরীর সম্পাদনায় 'আবার যুদ্ধে যাবো'। 'আবার যুদ্ধে যাবো' সংকলনটি ছিল মূলত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। আজকের প্রজন্ম এ ধরনের দুঃসাহসিক শিল্পিত প্রতিবাদকে কতটুকু উপলব্ধিতে নিতে পারবে জানি না; কিন্তু 'যারা বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর জনমনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, তাদের জন্য একটি মফস্‌সল শহরের গুটিকয়েক তরুণের এই অনন্য ভূমিকা একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে'।

১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম থেকে এসএম ফারুকের 'বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ও বাকশালের ভূমিকা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, তত্ত্ব ও তথ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি আজও অনন্য। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন এবং খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর রাজবন্দি হিসাবে দীর্ঘদিন কারান্তরালে বসে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বইটির লেখা শুরু করেন এসএম ফারুক। তাঁর রচিত আরেকটি গ্রন্থ হলো 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'।

১৯৮২ সালে এপিটাফ প্রকাশনীর ব্যানারে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হলো বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবি মহাদেব সাহার কাব্যগ্রন্থ 'তোমার পায়ের শব্দ'। 'তোমার পায়ের শব্দ' সম্ভবত বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ, যা কিনা চট্টগ্রাম থেকেই প্রকাশিত হয়। পরের বছর এপিটাফ প্রকাশনীর ব্যানারে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হলো কবি মিনার মনসুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এই অবরুদ্ধ মানচিত্রে' (প্রকাশকাল ১৯৮৩)। কবি মিনার মনসুরের এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের তিন মাসের মধ্যেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সামরিক স্বৈরাচার। কবির ওপর জারি করা হয় হুলিয়া। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু তোমার মৃত্যু আমাকে করেছে সাম্যের শ্রমিক'। তারপর থেকে লেখাটি চট্টগ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পায়।

আশির দশকে চট্টগ্রামের গ্রামীণ জনপদের অনেক তরুণ এমনিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তখন কলেজগুলোয় নিয়মিত 'দেয়ালিকা' প্রকাশিত হতো। কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে এ সময় প্রকাশিত হয় 'আবার আসিব ফিরে'। তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল মোমিন এবং সিরাজুল হক বাদশার সরাসরি তত্ত্বাবধানে 'আবার আসিব ফিরে' প্রকাশিত হলেও কলেজ শাখা ছাত্রলীগের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসাবে সম্পাদনার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকে। বিশেষ করে লেখা সংগ্রহ করা ছিল আমার একটি বিশেষ দায়িত্ব। তৎকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লেখা সংগ্রহ একটা অন্যতম দুরূহ কাজ ছিল। 'আবার আসিব ফিরে' দেয়ালিকাটির বৈশিষ্ট্য ছিল চমৎকার লিখনশৈলীর পাশাপাশি এর অঙ্গসৌষ্ঠব। লেখার সঙ্গে থাকত প্রাসঙ্গিক ছবি। হাতে আঁকা কোনো ছবি নয়, পেপার কাটিং। বঙ্গবন্ধুর নানান সময়ের ছবি সারা বছর সংগ্রহ করে রাখা হতো দেয়ালিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এসব ছবি দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিড় জমাত। আবদুল মোমিন এবং সিরাজুল হক বাদশার অসাধারণ কাব্য প্রতিভা ছিল। কিন্তু বৈরী সময়ের চাপে পড়ে মুজিব আদর্শের এই দুই সৈনিকের শিল্পিত কাব্য প্রতিভা বিকশিত হতে পারেনি। একই রকমভাবে অবিকশিত থেকে গেল অকালপ্রয়াত বশির উদ্দিন মাহমুদ, খোরশেদ আলম সুজন, অজয় মিত্র শংক, শৈবাল বড়ুয়া প্রমুখের শিল্পিত সাহিত্যপ্রতিভা। পঁচাত্তর-পরবর্তী ইতিহাসে প্রতিবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে

> ভাবতে ভালো লাগে, পঁচাত্তর-পরবর্তী নিষিদ্ধ সময়ে এবং সাম্প্রতিককালের মুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রতিবাদী ইতিহাস রচনায় চট্টগ্রাম অনন্য ভূমিকা পালন করে। যখন বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, তখনও প্রকাশ্যে স্বনামে হাতে সরব ছিলেন চট্টগ্রামের একদল লেখক

তাদের ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সেসময়ে ছোটো পুস্তিকার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর দর্শন প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন অ্যাডভোকেট জানে আলম, জমির চৌধুরী প্রমুখ। আজকের সাহিত্যাঙ্গনে তাদেরও কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯৯১ সালে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ইকবাল বাবুলের ছড়াগ্রন্থও ছিল বৈরী সময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি শিল্পিত প্রতিবাদ। এটি ছিল সম্ভবত চট্টগ্রামের কোনো শিশুসাহিত্যিকের বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত একক ছড়াগ্রন্থ।

১৯৯৪ সালের বিজয়মেলায় চট্টগ্রামের নন্দন থেকে প্রকাশিত হয় রহমান হাবীব এবং আমার সম্পাদনায় বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া সংকলন 'দাবাইয়া রাখতে পারবা না'। সংকলনটিতে ২৩ জন লেখকের ছড়া ছাপা হয়। তারা হলেন নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, মুহম্মদ নুরুল হুদা, বিপুল বড়ুয়া, অজয় দাশগুপ্ত, আমীরুল ইসলাম, আবদুল আজীজ, ওমর কায়সার, উৎপল বড়ুয়া, ইকবাল বাবুল, রহীম শাহ, রাশেদ রউফ, খালেদ সরফুউদ্দীন, আজিজ রাহমান, আনোয়ারুল হক নূরী, কামরুল হাসান বাদল, সুব্রত চৌধুরী, আবুল কালাম বেলাল, মালেক রানা, অপু বড়ুয়া, আবু হেনা দীপক, কুমার প্রীতীশ বল ও রহমান হাবীব।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আবুল ফজলের প্রদর্শিত কথাসাহিত্যের ধারা অনুসরণ করে পরবর্তী প্রজন্মের খুব বেশি লেখক এগিয়ে যাননি। অনেক পরে ১৯৯৪ সালের শোকের মাস আগস্টে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী আমার একটি গল্প 'তোরা বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেললি' প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালের শোকের মাস আগস্টে দৈনিক সংবাদ খেলাঘর পাতায় আমার আরেকটি গল্প 'বন্ধুজনের মুখচ্ছবি' প্রকাশিত হয়।

তিন.

বৈরী সময় পার করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রথমবার ক্ষমতায় আসে ১৯৯৬ সালের মধ্য জুনে। দীর্ঘ ১৯ বছর পর 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' দ্বিতীয় সংস্করণ (বর্ধিত) প্রকাশিত হয় মোনায়েম সরকার, মিনার মনসুর ও আমার সম্পাদনায়। মোট ৬৮৩ পৃষ্ঠার এই সংকলনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৯০ বিশিষ্টজনের প্রবন্ধ, ৫০ জন কবির কবিতা, ৬টি গল্প এবং একটি সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে কোনো লেখকের একাধিক লেখা স্থান পেয়েছে। প্রথম সংস্করণের কিছু লেখা বর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি অনেক নতুন লেখা যুক্ত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুবিহীন প্রথম ২২ বছর ছিল অন্ধকার যুগ, স্বাধীন শিল্প-সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। বঙ্গবন্ধু ছিল নিষিদ্ধ এক নাম। তাঁর নাম নেওয়া ছিল অপরাধ। ১৯৯৬-পরবর্তী সময়ে এসে তা পরিবর্তন হতে থাকে। ক্রমেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হতে থাকে। তবে একুশ শতকের প্রথম দশকে অতীতের বৈরী হাওয়ায় শকুনেরা আবার ডানা ঝাপটাতে চাইলেও অন্ধকার যুগে তৈরি করা ইতিহাসের নিভৃত নায়কদের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে নবীন প্রজন্ম নিজেদের পথ দৃঢ় করে ফেলে। জেগে উঠে আওয়াজ তোলে 'আমরা তোদের বিরুদ্ধে'। ফলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রতিবাদী সাহিত্যের অন্যতম নিভৃত নায়ক মিনার মনসুর বর্তমানের পরিবর্তিত মুক্ত সময়েও তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থ তিনটি হলো: 'আমার পিতা নয় পিতারও অধিক', 'পিতা-পুত্রী' এবং 'বঙ্গবন্ধু কেন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন'।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণামূলক কাজ করেছেন মুহাম্মদ শামসুল হক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো: 'স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু: প্রামাণ্য দলিল' (প্রকাশকাল ১৯৯৬), 'স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং বেতার ঘোষণার ইতিবৃত্ত' (প্রকাশকাল ১৯৯৯), 'স্বাধীনতার বিপ্লবী অধ্যায় বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য ৪৭-৭১' (প্রকাশকাল ২০১৬-২০১৯), 'টুঙ্গিপাড়ার খোকা যেভাবে জাতির পিতা' (প্রকাশকাল ২০২২), 'যুক্তি, তথ্যপ্রমাণ প্রেক্ষাপট: বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক', 'চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা' (প্রকাশকাল ২০২০), 'স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি ও বঙ্গবন্ধু-আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি (ইতিহাসের খসড়া সংস্করণ)' (প্রকাশকাল ২০১৮) এবং 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: প্রতিবাদের চাপা পড়া ইতিহাস'। মুহাম্মদ শামসুল হক তৃণমূলের মানুষের সঙ্গে কথা বলে, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিটি গ্রন্থ রচনা করে ভাবীকালের গবেষকের জন্য সমৃদ্ধ আকর সংগ্রহ করে রেখে যাচ্ছেন।

তরুণ লেখক শিবু কান্তি শীল লিখেছেন, 'আমার বঙ্গবন্ধু আমার স্বাধীনতা' (প্রকাশকাল ২০১৯)। বইটিতে গল্প, উপন্যাস, ছড়া-কবিতা, প্রবন্ধসহ বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আলাদা জীবনী সন্নিবেশিত আছে। 'বুকের ভেতর বঙ্গবন্ধু' (ছড়া কবিতা, প্রকাশকাল ২০১৭)। 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প জলপাই রঙের গাড়ি' (প্রকাশকাল ২০১৭)।

কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের মাঠটিও খালি পড়ে থাকেনি। আমার লেখা চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর আদর্শের সন্তানদের জীবন এবং পিতা হত্যার প্রতিবাদের ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস 'জনক ও তাঁর সন্তানেরা' (প্রকাশকাল ২০২২)। এছাড়া 'জাতির পিতা ও শেখ রাসেলের জীবনভিত্তিক দুটি ডকুড্রামা' (প্রকাশকাল ২০২২) এবং কিশোর গল্প সংকলন 'গল্পগুলো রাসেলের' (প্রকাশকাল ২০২২), কিশোর উপন্যাস 'আমার বন্ধু রাসেল'

(প্রকাশকাল ২০১৯)। 'বাঙাল কেন যুদ্ধে গেল'খ্যাত মুক্তিযোদ্ধা লেখক সিরু বাঙালি লিখেছেন 'দুনিয়া কাঁপানো মহামানব' (প্রকাশকাল ২০২০)। অধ্যাপক মোহীত উল আলম লিখেছেন 'ভাষা মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু', 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। মিলন নাথ লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবন'। ড. মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'। সাহিত্যিক আহমদ ছফা লিখেছেন 'শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। শিশুসাহিত্যিক সুজন বড়ুয়া লিখিত গ্রন্থগুলো হলো: 'বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনী: সোনার অক্ষরে লেখা নাম' (প্রকাশকাল ২০১৫), 'বঙ্গবন্ধু তুমিই বাংলাদেশ' (প্রকাশকাল ২০১২) এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আকাশ সমান মহান পুরুষ', 'ছোটদের বন্ধু বঙ্গবন্ধু-১' (প্রকাশকাল ২০১৯), 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প', 'বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা নিয়ে পাঁচটি গল্প (ক্যাপ্টেন খোকা)'। তিনি সম্পাদনা করেছেন 'শেখ রাসেল আমাদের ছোটো রাজকুমার'। হোসাইন আনোয়ার লিখেছেন 'শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হওয়ার গল্প', এমরান চৌধুরী লিখেছেন 'ফাদার অব দ্য নেশন', কালাম চৌধুরী লিখেছেন 'চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু', কালাম আজাদ লিখেছেন 'কক্সবাজারে বঙ্গবন্ধু'। শামসুল আরেফীন লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার দুর্লভ দলিল' (প্রকাশকাল ২০১৬)। ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার এবং ড. মো. শারুল মাশরেক মুজিবুল হক লিখেছেন 'সশস্ত্র সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়: নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু' (প্রকাশকাল ২০১৬)। প্রফেসর আবু জাফর চৌধুরী লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু পনেরো আগস্ট অতঃপর...' (প্রকাশকাল ২০১৮)। ডা. মাহফুজুর রহমান লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ-নিউক্লিয়াস' (প্রকাশকাল ২০১৯)। মো. শায়রুল মাশরেক লিখেছেন 'BANGABANDHU OUR GREAT LEADER FRIEND AND PHILOSOPHER' (প্রকাশকাল ২০১৬)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান লিখেছেন 'শেখ মুজিব-শেখ হাসিনা পিতা ও কন্যার কাহিনি'। নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'চরণরেখা তব বঙ্গবন্ধু ও পার্বত্য চট্টগ্রাম'।

কথাসাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সংগ্রাম', 'মুক্তির সংগ্রাম শেখ মুজিব', 'টুঙ্গিপাড়ার সেই অদম্য কিশোর'। সুব্রত বড়ুয়ার 'ধলপ্রহর' (২০২০) নামে যে উপন্যাস লিখেছেন, এর প্রধান অনুষঙ্গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতার প্রস্তুতি, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রেরণা-পুরুষ। এছাড়া সুব্রত বড়ুয়া মুনতাসীর মামুনের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন 'মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু' (প্রকাশকাল ২০১৯)। কথাসাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া লিখেছেন 'ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু'। অম্লান দেওয়ান লিখেছেন 'বিশ্বজয়ী বঙ্গবন্ধু'। আহমেদ মওলা লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা'। জগন্নাথ বড়ুয়া লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ি'। ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন 'বাঙালির বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু শেখ মুজিব'। বিশ্বজিৎ সেন লিখেছেন 'শেখ মুজিবনামা', বাসুদেব খাস্তগীর লিখেছেন 'কবিতায় ইতিহাস কবিতায় মুজিব'। উৎপল কান্তি বড়ুয়া লিখেছেন 'শোনো মুজিবুর'। জসীম মেহবুব লিখেছেন 'এক মুজিবুর শেখ মুজিবুর'। মিলন বনিক লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ রাসেলের গল্প'। আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী লিখেছেন 'ভাইয়েরা আমার', 'নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু'। অপু বড়ুয়া লিখেছেন 'ছোটদের প্রিয় বঙ্গবন্ধু'। সৌরভ সাখাওয়াত লিখেছেন 'আমাদের বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ'। কামরুল হাসান বাদল লিখেছেন 'মুক্তির প্রবক্তা শেখ মুজিব'। আখতারুল ইসলাম লিখেছেন 'মুক্তির সুর শেখ মুজিবুর', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' (জীবনীগ্রন্থ)। কাশেম আলী রানা লিখেছেন 'শুভ জন্মদিন খোকা'। শুকলাল দাশ লিখেছেন 'মুজিব তুমি বজ্রকণ্ঠ অটল হিমালয়'। কাঞ্চনা চৌধুরী লিখেছেন 'গণ মানুষের গণ দেবতা'। রুনা তাসমিনা লিখেছেন 'প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু'। শিশুসাহিত্যিক রহীম শাহ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আটটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এগুলো হলো: 'পঁচাত্তরের সেই দিন' (২০০০), 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১০১ কিশোর রচনা' (২০১১), 'গদ্যে-পদ্যে শেখ মুজিব' (২০১৩), 'শত লেখায় বঙ্গবন্ধু' (২০২১), 'স্মরণে বরণে বঙ্গবন্ধু' (২০২১), 'বঙ্গবন্ধুর জন্য ১০০ ছড়া' (২০২১), 'শত ছড়ায় বঙ্গবন্ধু' (২০২১) এবং 'গল্পে গল্পে বঙ্গবন্ধু'। কবি জিন্নাহ চৌধুরী সম্পাদনা করেছেন 'কবিতায় বঙ্গবন্ধু'। তানভীর হাসান বিপ্লব সম্পাদনা করেছেন 'মুজিব মানে বাংলাদেশ'। যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী সম্পাদিত 'শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণীয়: বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব' গ্রন্থটিতে বঙ্গমাতার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। মার্জিত ও রুচিসম্মত প্রকাশনাটির ১০৪ পৃষ্ঠার কলেবরে বঙ্গমাতাকে নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণায় সন্নিবেশিত হয়েছে শতাধিক সংবাদচিত্র, যার বেশির ভাগই দুর্লভ।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'জাতির পিতা' (প্রকাশকাল ২০২০) শিরোনামের সংকলনটি সাম্প্রতিককালে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে ১২৮ জন লেখকের লেখা স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশ লেখক জন্মসূত্রে চট্টগ্রামের। নন্দিত এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন নেছার আহমদ, উপদেষ্টা সম্পাদক ড. অনুপম সেন এবং প্রকাশনা উপদেষ্টা রাশেদ রউফ। এ ছাড়াও নেছার আহমেদ লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ'।

শিশুসাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সংগঠক রাশেদ রউফ লিখেছেন 'তীর্থভূমি' (প্রকাশকাল ২০১৭) এবং তিনটি প্রবন্ধ, তিনটি গল্প এবং পনেরোটি কবিতার নন্দিত সংকলন 'বঙ্গবন্ধু তুমি অজর অমর' (প্রকাশকাল ২০২০), 'দশদিগন্তে বঙ্গবন্ধু' (প্রকাশকাল ২০২১)। বঙ্গবন্ধু নিয়ে তার সম্পাদিত সংকলনগুলো হলো 'বাঙালি', 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি' এবং 'দাবাইয়া রাখতে পারবা না'। তার 'দশদিগন্তে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থে সংকলিত ১৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ধারাবাহিকভাবে দৈনিক আজাদীতে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজে শুধু লেখেননি, তার প্রতিষ্ঠিত শৈলী প্রকাশনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের অনেক তরুণ লেখককে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

চার.

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে প্রথম বঙ্গবন্ধু উপাধি ব্যবহার করেন ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্রনেতা চট্টগ্রামের রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক। ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন সামনে রেখে তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের খবর প্রকাশ, বিকাশমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক আর শেখ কামাল একটি বুলেটিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। বুলেটিনের নামকরণ করা হয় 'প্রতিধ্বনি'। এ পত্রিকার একটি সংখ্যায় রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক 'সারথী' ছদ্মনামে 'আজবদেশ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। লেখাটির শেষদিকে 'বঙ্গশার্দূল' শেখ মুজিবের নামের পাশে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রথম ব্যবহার করেন রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক।

রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক চার পৃষ্ঠাব্যাপী সেই নিবন্ধের উপসংহার লিখলেন, পরিশেষে একটি কথা বলা যায়, দুই অংশের পার্থক্য ও অমিলকে স্বীকার করে দুই অংশের পৃথক ভাষা, সংস্কৃতি ও

> বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, 'ছাত্রলীগের ছেলেরা এত সুন্দর প্রকাশনা বের করতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। এটা প্রকাশ করতে তোর তো অনেক টাকা খরচ হয়েছে।'

ইতিহাসকে পাশাপাশি স্থান দিয়ে এবং সর্বোপরি পূর্ববাংলার নয়নমণি-মুক্তিদিশারি, 'বঙ্গবন্ধু', সিংহশার্দূল শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ছয় দফা কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে আজব ও অভিনব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি টিকে থাকতে পারে নতুবা নয়।

এই 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকায় '৬৮ সালের নভেম্বর ইস্যুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত পূর্ববাংলার 'মুক্তিসনদ' ছয় দফা শিরোনাম হয়ে আসে। তখন অবশ্য ছোটো হেডিংয়ে অখ্যাত এক পত্রিকায় ব্যবহৃত 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি ঢাকার ছাত্রমহলের একাংশ ছাড়া অন্য কারও নজর কাড়েনি। হয়তো স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় সেসময় শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে এমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের ভাবনাটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। ওটা গুরুত্ব পায় ঠিক তখন, যখন জাগ্রত বাঙালি জাতির জাগরণের সব স্রোতোধারা এক মোহনায় একাকার, যখন গণমোহন মুজিব বিদ্রোহী বাংলার মুকুটহীন সম্রাট। মুজিবের জন্য জুতসই খেতাব হিসাবে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান ও উনসত্তরের তরুণ নেতৃত্বের সবার খুবই পছন্দ হয়েছিল। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পান শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তখন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। উনসত্তরের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের গণসংবর্ধনায় ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকেই শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে এতদিনের প্রচলিত 'মুজিব ভাই', 'বঙ্গশার্দূল', 'সিংহশার্দূল' ইত্যাদি বিশেষণকে ছাপিয়ে 'বঙ্গবন্ধু' নামটিই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'বঙ্গবন্ধু' নামটি পরবর্তীকালে তাঁর নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। এখন তো 'বঙ্গবন্ধু' উচ্চারণ করলে আর শেখ মুজিব বলতে হয় না। একইভাবে শেখ মুজিব নাম উচ্চারণ করতে গেলে 'বঙ্গবন্ধু' চলে আসে অবলীলায়। আজ শেখ মুজিব মানে 'বঙ্গবন্ধু', 'বঙ্গবন্ধু' মানেই শেখ মুজিব।

রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক বন্ধু রায়হান ফেরদাউস মধুর সহযোগিতায় '৭০ সালে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর জীবনী বিষয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। ২৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির নাম ছিল 'এই দেশেতে জন্ম আমার'। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন মরহুম কালাম মাহমুদ। এটাই ছিল ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর জীবনীবিষয়ক পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে দিলে বঙ্গবন্ধু খুশিতে রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাককে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ আদর করলেন। বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, 'ছাত্রলীগের ছেলেরা এত সুন্দর প্রকাশনা বের করতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। এটা প্রকাশ করতে তোর তো অনেক টাকা খরচ হয়েছে।' রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক ছিলেন নিরুত্তর। বঙ্গবন্ধু পকেট থেকে পাঁচশত টাকা বের করে রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাকের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটি তোর কাছে রাখ'।

পাঁচ.

পঁচাত্তর-পরবর্তী নিষিদ্ধ সময়ে চট্টগ্রামের অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে সংকলন, স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা ধরনের লেখা প্রকাশিত ছিল। চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়মেলার পক্ষ থেকে স্মরণিকায়ও প্রতিবছর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা ধরনের লেখা থাকে। দলের নেতাকর্মী ছাড়াও দেশ-বিদেশের লেখকদের লেখা এসব প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়া এবং এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা ছিল এসব সংকলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে বঙ্গবন্ধুর অবদান, স্মৃতিচারণা এবং আদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকত। প্রচারসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এখানে প্রকাশিত লেখাগুলোর বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে, সে সঙ্গে এসব লেখার অনেক প্রতিবাদী লেখকও, যাদের কয়েকজনের নাম এ লেখার শুরুতে উল্লেখ করেছি। অথচ এসব লেখা পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চার ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারত। তাই সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত এ নিবন্ধে কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চট্টগ্রামের প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চার পূর্ণাঙ্গচিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও পত্রপত্রিকায় এক বা একাধিক প্রবন্ধ, কবিতা কিংবা ছড়া লিখে পিতা হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চায় শামিল হয়েছেন যারা, তাদের কথাও এ লেখায় বলা হয়নি সীমাবদ্ধতার কারণে। এ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ভাবীকালের গবেষককে উদ্বুদ্ধ করা, যিনি ইতিহাসের সত্যের প্রয়োজনে মাঠপর্যায়ে কাজ করে সবকিছু একত্রিত করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চট্টগ্রামের প্রতিবাদী সাহিত্যচর্চার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবেন। কারণ, বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং জীবনচর্চা যুগের পর যুগ প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে এসব রচনা অতি অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

১৫ই আগস্ট: অপপ্রচার ও ইতিহাস হত্যার ষড়যন্ত্র

মাহামুদুল হক

বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম জঘন্যতম রক্তপাত ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ওইদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে ঢাকা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে গুলি করে হত্যা করা হয়। এটা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যাই নয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে হত্যা করার প্রচেষ্টাও ছিল। জাতির গৌরবগাথা ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে মুছে ফেলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় হত্যাকারীরা।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার নথিপত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, নতুন সরকার গঠন এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি একই সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল ঢাকা সেনানিবাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর ৩টার দিকে (উদ্ধৃত: Liton, 2016)। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম মৃতদণ্ডপ্রাপ্ত খুনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মুহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেন, "হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মূল হোতা মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ঢাকা সেনানিবাসে সৈন্যদের বলেন যে, 'শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করে খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠন করা হবে। এটা হবে ইসলামি সরকার (উদ্ধৃত: Liton, 2016)।" মেজর ফারুক রহমান হাঁটুর ওপর হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার ম্যাপ নিয়ে সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন পরিকল্পনাকারী মেজর আব্দুর রশিদ। মেজর ফারুক রহমান বঙ্গবন্ধুর সরকার এবং বাকশাল ও রক্ষীবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে সশস্ত্রবাহিনীর সৈন্যদের উসকে দেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল–এমন মিথ্যা অভিযোগও ছড়ান তিনি সেনানিবাসে জমায়েত হওয়া সৈনিকদের মাঝে। ফারুকের ব্রিফিংয়ের পরপরই সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো ধানমন্ডি রোড-৩২-এ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ফাঁকা রাস্তায় নেমে আসে। জাতির মহান নেতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বুলেট দিয়ে হত্যা করে তারা (উদ্ধৃত: Liton, 2016)।

উনিশ শ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির মদতপুষ্ট সামরিক শাসক এবং একাত্তরের পরাজিত শক্তি ইতিহাসের এই আইকনকে নিয়ে অপপ্রচারের জাল বিস্তার করে। মূলত ওই হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করতে নানা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দেশবাসীর সামনে প্রচার করে। 'The conspirators and the killers did a massive propaganda to rationalize the killing of Bangabandhu and his near and dear ones. …They tried in vain to suppress the glorious history of the struggle of Bangabandhu for the independence of Bangladesh.' (Ahmed, 2014)। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাস নির্মাতা। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। তিনি জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন সারা জীবন, ৫৫ বছরের জীবনে জেল খেটেছেন ১৩ বছরের অধিক সময়, স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছেন বাঙালি জাতিকে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ নির্মাণে নিয়োজিত হয়েছেন পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই। একাত্তরের পরাজিত শক্তি সেই অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। ওই অপপ্রচারের গুঞ্জন এখন আকাশচুম্বী না হলেও এখনো অনেকের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান। কারণ সামরিক শাসকদের পালিত কিছু বুদ্ধিজীবী বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের গুরুদায়িত্ব পালন করেছে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে। আর সেসব মিথ্যা ও বিভ্রান্তি দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরতে থাকে বছরের পর বছর। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল সুদীর্ঘ ২০ বছর একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে ওইসব মিথ্যা এবং বিভ্রান্তির গল্প শুনে। বঙ্গবন্ধুর সব কীর্তিকে মুছে ফেলতে যত চেষ্টা করা দরকার, তারা সব চেষ্টাই চালিয়েছে (সিদ্দিকী, ২০১৭)।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কোন ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়েছিল? বিষয়টি জানতে অপপ্রচারের ধারণায়ন, ধরন ও এর ইতিহাস জানা জরুরি। অপপ্রচার বা প্রচারণার ইংরেজি 'propaganda'। বাংলাদেশে প্রচার অর্থে অনেকে প্রচারণা শব্দটি ব্যবহার করেন; কিন্তু এ ব্যবহার ধারণাগতভাবে সঠিক নয়। কারণ প্রচার প্রক্রিয়াটি সত্য-সঠিক তথ্য বা বার্তার বিচ্ছুরণ। অন্যদিকে প্রচারণা প্রপঞ্চটি মিথ্যা তথ্য বা বার্তার বিচ্ছুরণ। প্রচারণা হচ্ছে অপতথ্য, ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, মিথ্যা তথ্য বা ভুল তথ্যের বুননে ধোঁকাবাজি বা স্বার্থসিদ্ধির প্রক্রিয়া। ১৬২২ সালে 'propaganda' প্রপঞ্চটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। ওই সময় পঞ্চদশ পোপ গ্রেগরি দ্বারা বিদেশি মিশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল কমিটির একটি কমিটির নাম ছিল 'প্রোপাগান্ডা'। এর আগেও প্রচারণা কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপকভাবে প্রচারণা শব্দটি ব্যবহৃত হয় ১৯৩৩ সালে যখন হিটলার জোসেফ গোয়েবেলসকে পাবলিক ইনলাইটেনমেন্ট অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতায় না গিয়ে প্রচারণার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল গোয়েবেলসের কাজ। মার্কিন তাত্ত্বিকরা তিন ধরনের প্রচারণা চিহ্নিত করেন–কালো, সাদা ও ধূসর। কালো প্রচারণা (black propaganda) মিথ্যার ইচ্ছাকৃত ও কৌশলগত বিচ্ছুরণ বা প্রচারণা, যা নাৎসি বাহিনী কর্তৃক চিত্রিত ছিল। সাদা প্রচারণা (white propaganda) সম্ভাব্য ক্ষতিকারক তথ্য এবং ধারণাগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত প্রচারণা প্রক্রিয়া, যা সংকটযুক্ত ঘটনাগুলো থেকে মনোযোগ ভিন্নদিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়। ধূসর প্রচারণা (gray propaganda) এমন তথ্য এবং ধারণার বিচ্ছুরণ, যা মিথ্যা হতে পারে বা মিথ্যা নাও হতে পারে। রাজনৈতিক অপপ্রচার সব যুগেই ছিল। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর কালো ও সাদা উভয় ধরনের অপপ্রচার পরিকল্পিতভাবে চালানো হয়েছে দেশে-বিদেশে। হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করার সব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না মর্মে সংবিধানে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে কালো আইন পাশ করা হয়।

১৫ আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পর গণমাধ্যম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেয় সামরিক সরকার। ১৫ আগস্টের পর 'বঙ্গবন্ধু' নামটি উচ্চারণ করা হতো না বা করা যেত না রাষ্ট্রীয় কোনো গণমাধ্যমে। এমনকি বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর মতো যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত কিছু পত্রিকা বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবরটি এমনভাবে প্রকাশ করেছে, যা সেনাসমর্থিত সরকারের পক্ষেই গেছে (বিশ্বাস, ২০১৭)। হত্যাকাণ্ডের পরদিন ১৬ আগস্ট ঢাকা রেডিয়োর সংবাদে বলা হয়, "দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত এবং তাঁর 'স্বৈরাচারী' সরকারের পতন ঘটেছে। রেডিয়োর সংবাদে আরও বলা হয়েছে, খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সব শান্তিকামী ও দেশপ্রেমিক নাগরিককে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে (ভৌমিক, ২০১৮)।" ওই সময় দেশে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, ডেইলি অবজারভার ও দ্য টাইমস নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে কারফিউ, অন্যদিকে পত্রিকা সরবরাহে খুনিদের নিষেধাজ্ঞার কারণে পাঠক পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারেনি। তারা জানতে পারেনি ওইদিনের পত্রিকায় কী ছিল। খুনিরা সকালেই চারটি পত্রিকার সব কপি বাজেয়াপ্ত করে সরিয়ে ফেলে। প্রেসম্যাটার বিনষ্ট করে ফেলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কিছু সহকর্মী ও সাংবাদিকের বদৌলতে ওইদিনের কাগজ সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষিত কাগজ থেকেই আমরা জানতে পারি ওইদিনের দৈনিকগুলোয় কী কী ছিল। অবৈধ রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমল পর্যন্ত এসব জানা যায়নি (পিআইবি, ২০১৩)। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর অবৈধ ক্ষমতা দখলের মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পত্রিকাগুলোর শিরোনামও রাতারাতি পালটে যায় এবং গণমাধ্যমকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অবৈধ সামরিক শাসক জনগণের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে, বঙ্গবন্ধুর সব কীর্তিকে চিরতরে মুছে ফেলার কিছু চতুর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সব গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো, বঙ্গবন্ধুর কথা বলা একদম বন্ধ করে দেওয়া হলো। ২০ বছর রেডিয়ো-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয়নি (সিদ্দিকী, ২০১৭)। মুহম্মদ জেএ সিদ্দিকী বলেন, 'যেই মানুষটির কণ্ঠ বাংলার নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল, যিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছিলেন, দিয়ে গিয়েছিলেন একটি পতাকা, একটি মানচিত্র। বাংলার প্রতিটি মানুষের প্রতি যাঁর ছিল নিরন্তর ভালোবাসা। জাতিবর্ণনির্বিশেষে শুধু মানুষকে ভালোবাসতে পারার অসম্ভব এই ক্ষমতাটিই যাঁকে বাংলার গণমানুষের নেতায় পরিণত করেছিল, সেই মানুষটিকে একনিমেষে দেশের সব মিডিয়া, সব প্রকাশনা ভুলে গেল। সামরিক শাসকের দল সেখানেই থেমে থাকেনি, তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নামে নানান মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যে ভরা গল্প চারদিকে ছড়িয়ে দিল (সিদ্দিকী, ২০১৭)।' শুধু রেডিয়ো-টিভি-সংবাদপত্র নয়, তথাকথিত একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীরাও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় বই প্রকাশের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সফল কীর্তিতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পাশাপাশি ওইসব বুদ্ধিজীবী সুকৌশলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যেও কিছু বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেয়। খুব কৌশলে এসব বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার রাজনীতিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অসাধু গবেষক ও লেখকদের মুখ দিয়ে বই-পুস্তক-সংবাদপত্র ব্যবহার করে। এমনকি তারা কিছু দেশপ্রেমিক জনগণ, যারা বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার আদর্শকে বিশ্বাস করে, তাদেরও মিথ্যা তথ্য বিশ্বাস করাতে সফল হন (Chowdhury, 2019)।

সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে একদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, দুর্ভিক্ষ; অন্যদিকে নিজ দলের লোকদের দুর্নীতিতে বঙ্গবন্ধু

হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর নিজ দলের অনেক গণপরিষদ সদস্য ও এমসিএকে বহিষ্কার করেন। প্রায় সাড়ে তিন বছরের প্রতিটি দিন এমন বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে করতে তিনি একেবারে শেষে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে। কাউকেই তিনি আর ভরসা করতে পারছিলেন না। দুর্ভিক্ষে এত মানুষের মৃত্যু তাঁকে বিমর্ষ ও ডেসপারেট করে তুলেছিল। এত নাশকতা, এত বৈরিতা, এত দুর্নীতি একসময় তাঁকে বাধ্য করেছে নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিতে, বাকশাল গঠন করতে (উদ্ধৃত: বাগচী, ২০১৯)। এজন্যই তো পঁচাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভায় বলেছিলেন, 'আমি পাকিস্তানিদের যে আঘাত করেছিলাম, তার চেয়েও আরও বড়ো ধরনের আঘাত হানতে চাই বর্তমান ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে' (উদ্ধৃত: বাগচী, ২০১৯)। In their propaganda, they propagated that they were going to bring peace and tranquility along with the prosperity in the country, which was going through some chaos in the post-war Bangladesh (Ahmed, 2014).

অপপ্রচারের অন্যতম আলোচনার বিষয় হিসাবে নেওয়া হয় বাকশাল গঠন। বাংলাদেশের সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগকে (বাকশাল) দ্বিতীয় বিপ্লব হিসাবে ঘোষণা করে তা প্রতিষ্ঠা করেন। অপপ্রচারকারীদের মতে, বাকশাল ছিল একদলীয় শাসনব্যবস্থা। বিরোধিতার কোনো অবকাশ নেই, গণমাধ্যম সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে; রাষ্ট্র, সরকার ও দল একত্রিত এবং সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিচারক, আমলা এর সদস্য।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একটা অপপ্রচার দেশবাসীর কাছে চালানো হয় যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বাকশাল গঠন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অপপ্রচারের সারকথা ছিল বাকশাল হলো বঙ্গবন্ধুর 'একনায়কতান্ত্রিক' একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর এ কারণে সেনাবাহিনী তাঁকে হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে 'রক্ষা' করেছে। বাকশালের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল ওই সরকারসহ স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও লেখক। আর নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে ওই অপপ্রচার স্থান করে নিয়েছে। বাকশাল একটা খারাপ বা বাজে পদ্ধতি এমন বদ্ধমূল ধারণা এখনো অনেকের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। এমনকি এখনো যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক, তারাও বাকশাল নিয়ে কথা বলতে চান না বা ভয় পান। বাকশাল নিয়ে অপপ্রচারটা কোন পর্যায়ে গেলে বা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করলে এমনটা হতে পারে, তা যোগাযোগীয় গবেষণার বিষয়। অথচ ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে বাকশাল একটা প্ল্যাটফরম হিসাবে বঙ্গবন্ধুর স্ব-উদ্ভাবিত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা মূলত ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাপক পরিকল্পিত প্রচারণা দিয়ে। কী ছিল বাকশালের কাঠামো ও দর্শনে? বাকশাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কী বলেছেন, তাঁর বক্তব্য এখানে হাজির করলেই বোঝা যায় বাকশাল নিয়ে যা বলা হয় তা নিছক অপপ্রচার।

বাকশালকে বঙ্গবন্ধু 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসাবে দেখেছেন। দেশের বিদ্যমান আইন ও সংবিধান মেনে কোনো বিপ্লবের ধারণা বিশ্বে এটাই প্রথম। স্বাধীনতার পর এটি ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লব। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু এ বিপ্লবের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, 'একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের প্রত্যেক বছর

বাকশাল নিয়ে অপপ্রচারটা কোন পর্যায়ে গেলে বা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করলে এমনটা হতে পারে, তা যোগাযোগীয় গবেষণার বিষয়। অথচ ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে বাকশাল একটা প্ল্যাটফরম হিসাবে বঙ্গবন্ধুর স্ব-উদ্ভাবিত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ছিল

৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বছরে বাংলার কোনো জমি থাকবে না চাষের জন্য। বাংলার মানুষেরা বাংলার মানুষের মাংস খাবে, সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো তিন নম্বর কাজ।

এক নম্বর হলো দুর্নীতিবাজ খতম করুন। দুই নম্বর হলো কারখানায়, খেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর পপুলেশন প্ল্যানিং আর চার নম্বর হলো জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য এক দল করা হয়েছে। যারা দেশকে ভালোবাসে, যারা এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মেনে সৎ পথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন। যারা বিদেশি এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয় এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছি একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগাতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বাধীনতা পুরস্কার

বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রবর্তন করেছিলেন। বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতার ইচ্ছা ছিল দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত দেশে পরিণত করা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করা। এজন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন একই প্ল্যাটফরমের অধীনে। কিন্তু প্রথম থেকেই বাকশালের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা লক্ষ করে যে গণহত্যা সত্ত্বেও স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাঙালিরা এবং যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী অর্জন করবে। এজন্য তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধেও অপপ্রচার শুরু করে।

বাকশালের শাসনামলে ভোটের অধিকার হরণ করার কোনো সুযোগ ছিল না। বাকশাল পদ্ধতিতে যে কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং নির্বাচনে ব্যয় রাষ্ট্র বহন করে। একই আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম এক পোস্টারে ছাপা হবে। পোস্টার ছাপাবে রাষ্ট্র। জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবে। বঙ্গবন্ধু আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন জনগণকে পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচনে।

বাকশাল গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কারও প্রেশার বা প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ বা মাথা নত করার অভ্যাস বা মানসিকতা আমার নেই। এ কথা যারা বলেন, তারাও তা ভালো করেই জানেন। তবে অপপ্রচার করে বেড়াবার বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই, তাই ওনারা এ কাজে আদাজল খেয়ে নেমেছেন। করুন অপপ্রচার। আমি স্বজ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ করে, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে, আমার দীনদুঃখী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমি বাকশাল কর্মসূচি দিয়েছি। আমি যা বলি, তাই করে ছাড়ি। যেখানে একবার হাত দিই সেখান থেকে হাত উঠাই না। বলেছিলাম এদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব, মুক্ত করেছি। বলেছি শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলা গড়ব, তাই করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। কোনো কিন্তুটিন্তু নাই, কোনো আপস নাই' (*বাগচী, ২০১৯*)।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে প্রচারণা চালানো হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সাল–মাত্র এই দুবছরে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির গঠনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সেসময় বঙ্গবন্ধু সরকারের এই অভাবনীয় সাফল্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (বাগচী, ২০১৯)। ১৯৭৪ সালে স্মরণাতীতকালের প্রচণ্ড বন্যা ও মানবসৃষ্ট চক্রান্তের কারণে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে খাদ্যসংকট তীব্র আকার ধারণ করে রিক্ত-হাহাকার মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট এ দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনাহারী মানুষের মৃত্যুসংবাদ আসছে। বঙ্গবন্ধু প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য। একসময় আকস্মিক সবাইকে বিমূঢ় করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজের চোখ দুটো দুহাতে ঢেকে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। তারপর ক্রন্দনরত মুখখানি দুহাতে চেপে ধরলেন (উদ্ধৃত: বাগচী, ২০১৯)। এ দুর্ভিক্ষ নিয়েও ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয় ওই সময় এবং ১৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে। যে মানুষটি সারা জীবন জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, সে মানুষটিকে বিপদে ফেলেছিল ওই কুচক্রীমহল ও মার্কিন ষড়যন্ত্র। কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্স (নিউইয়র্ক)-এর জার্নাল ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে (বাগচী, ২০১৯)। তাতে দেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারকে দুর্বল করার জন্য কীভাবে তাদের খাদ্য রপ্তানি নীতিকে ব্যবহার করেছে। ফুড পলিটিক্স শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে এমারথচাইল্ড লিখেছেন: সিআইএ 'খাদ্যই শক্তি' এই নব্য মতবাদকে সামনে রেখে খাদ্য-রাজনীতি দ্বারা ক্ষমতা ও প্রভাব খাটানোর কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সিআইএর সেই খাদ্য-রাজনীতির শিকার হয়েছে–মৃত্যু হয়েছে সহস্র, অযুত অযুত মানুষের। ওই গবেষণা নিবন্ধে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে: বাংলাদেশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বাণিজ্যিক বাজার থেকে আমেরিকান খাদ্য কিনে। ১৯৭৪ সালের শুরুতেই বাংলাদেশ সরকার খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে। সেসময় চলতি বাজার দরেই এসব খাদ্য ক্রয়ের কথা ছিল। আর এই খাদ্য ক্রয়ের অর্থ জোগানো হতো সুদহারের ঋণ থেকে। ১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় ঋণ সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মার্কিন খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছানোর জন্য স্থিরীকৃত দুটি বড়ো চালানের বিক্রয় বাতিল করে। বাংলাদেশ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তখন মার্কিন সরকারের ঋণলাভে ব্যর্থ হয়। বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, একই সঙ্গে পিএল-৪৮০ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পাঠাতে বিলম্বিত করা হয় (বাগচী, ২০১৯)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য পাঠাতে অহেতুক কালক্ষেপণ করল। অজুহাত হিসাবে তারা বলল, কিউবায় পাঠানো পাটের থলের সরবরাহ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য খাদ্যশস্যের ছাড় দেওয়া হবে না। সুতরাং চুয়াত্তরের অক্টোবর পর্যন্ত কোনো খাদ্যশস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দিল না। যদিও-বা ১৯৭৪ সালের ৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে খাদ্য পাঠানোর সবুজ সংকেত দেয় এবং দীর্ঘ দুমাস পর অর্থাৎ ডিসেম্বরে যখন আমেরিকা থেকে খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়, তখন বাংলার আকাশ-বাতাস অনাহারী মৃত মানুষের লাশের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে (সাইয়িদ, উদ্ধৃত: বাগচী ২০১৯)। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল এই দুর্ভিক্ষ। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করে নানা অপপ্রচার এখনো বিরাজমান।

অপপ্রচারকারীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়েও অপপ্রচার শুরু করে। একসময় জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার 'ঘোষক' বানাতে চেষ্টা চালায়। অথচ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেই বলেন, '৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে (সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার) এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো' (রহমান, ১৯৭২)। আর ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিব আসলে তাঁর চূড়ান্ত স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন, যা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাও শুনেছিল। ২৫ মার্চ রাত ১২টা ১৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি লিখে স্বাক্ষর করেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি ছিল বাংলা ও ইংরেজিতে, ওয়্যারলেসে রেকর্ড করা হয় ১২টা ২০ মিনিটে। একই রাতে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে রাত পৌনে ১টায় বঙ্গবন্ধু আরও একটি স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ইপিআর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পাঠান। দ্বিতীয় বার্তাটি ছিল: 'এটাই হয়তো বা আমার জীবনের শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ আপনারা যে যেখানে থাকুন, আপনাদের কাছে যা কিছু আছে, তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর প্রতিরোধ করুন। বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে না তাড়ানো এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন' (উদ্ধৃত: বাগচী, ২০১৯)। মুসা সাদিক এক সাক্ষাৎকারে টিক্কা খানের (তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর) কাছে জানতে চান–কেন শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জবাবে টিক্কা খান

বলেন, 'My COD (Co-ordination Officer) brought to me a three band Radio and told me to listen to the broadcast which said that Sheikh Mujib Saheb given a call for independence. Personally, I heard Sheikh Saheb declaring independence, for I know his voice so well. That declaration was the reason and so, I as the then supreme authority of East Pakistan, I had to arrest him, and there being no other alternative' (উদ্ধৃত: Chowdhury, 2007)। অর্থাৎ, গ্রেফতারের আগে রেডিয়োতে বঙ্গবন্ধুর মুখে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে তাঁকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয় টিক্কা খান। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান কালুরঘাট রেডিয়ো স্টেশন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এরপর ২৭ মার্চ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান একই রেডিয়ো স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ তার বইয়ে বলেছেন: আমি জিয়াউর রহমানকে এক পাতা কাগজ দিলাম। জিয়া পকেট থেকে কলম বের করে লিখলেন: 'I, Major Zia, do hereby declare independence of Bangladesh.' এরপর বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াকে বললেন, আপনি কি 'on behalf of Bangabandhu' এমন কিছু বলতে চান? জিয়া বললেন, 'আপনি সঠিক বলেছেন।' এরপর জিয়া তার নামের পাশে লিখলেন: 'On behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman...' (মোহাম্মদ, ২০০৩)। ২৬ ও ২৭ মার্চ গার্ডিয়ান, টাইমস অব লন্ডন, ইভেনিং নিউজ, ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সব গণমাধ্যম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও গ্রেফতারের খবর ফলাও করে প্রচার করে। জিয়াউর রহমান তার জীবদ্দশায় কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করেননি। অথচ জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে এখনো অপপ্রচার চলে। এমনকি এ কথাও অপপ্রচারকারীরা বলে যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি।

ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর গৌরবগাথা অবদান অবজ্ঞা করা হয়েছে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনায় গ্রন্থ-গণমাধ্যমে এবং বক্তৃতা-বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে শুধু উপেক্ষা করা হয়েছে। এমনকি, '...সংশ্লিষ্ট লেখকগণ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে শুধু উপেক্ষাই করেননি, অনেক ক্ষেত্রে...তাঁর অবদানকে খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন' (আলীম, ২০২১)। কৌশলে সত্য চেপে যাওয়াও অপপ্রচার। অথচ বঙ্গবন্ধু ধারাবাহিকভাবে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জনে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। '...ভাষা অন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদান সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায় তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন প্রতিবেদনসমূহ (শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্পাদিত Secrete Documents of Intellegence Branch on Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) প্রকাশের ফলে' (আলীম, ২০২১)। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক যুব সম্মেলনে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব (১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পরপরই); ভাষার দাবিসহ ২১-দফায় স্বাক্ষর; ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগকে ভাষা আন্দোলনে ব্যবহার; তমদ্দুন মজলিসের কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান; মুসলিম লীগের কনফারেন্সে ভাষার দাবির মিছিলে নেতৃত্বদান; সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশনা; ১১ মার্চ ভাষার দাবিতে ধর্মঘটে সরাসরি নেতৃত্বদান এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দাবি দিবস ও ধর্মঘট পালনের নির্দেশনা ভাষা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল (হক, ২০২২)। ধারাবাহিকভাবে মুসলিম লীগ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করতেও বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ভাষা আন্দোলন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম-আন্দোলন করে বাংলা ভাষা, বাংলা ভূখণ্ড ও বাংলার জনগণের সার্বিক মুক্তি এনে দিয়েছেন ১৯৭১ সালে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান দল-মতের ঊর্ধ্বে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, এদেশের ইতিহাসের নির্মাতা ও আইকন। ইতিহাসের যেমন মৃত্যু নেই, বঙ্গবন্ধুরও মৃত্যু নেই। ইতিহাস ইতিহাসই। ইতিহাসকে হত্যা করা যায় না, সাময়িক দমিয়ে রাখা যায় মাত্র। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ইতিহাস বিকৃতি বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে সত্যের অগ্নিশিখা দমন করা যায়নি। অপপ্রচারে লিপ্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যা বাণী আজ লুপ্তপ্রায়। তবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বাণী সঠিকভাবে যোগাযোগীয় পদ্ধতিতে আরও বিচ্ছুরণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সব অপপ্রচারের মূলোৎপাটন ঘটে।

তথ্যসূত্র

১. হক, মোহা. মাহামুদুল (২০২২), ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা অন্বেষণ, গৃহীত ও প্রকাশিতব্য, জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্স, ভলি-৫, নং-২ (বিশেষ সংখ্যা), বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

২. আলীম, এম আব্দুল (২০২১), বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩. Ahmed, Shabbir (2014). Evil Designs on the Fate of Bangladesh after the Assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman [Online], Available at https://enblog.mukto-mona.com/2014/08/15/evil-designs-on-the-fate-of-bangladesh-after-the-assassination-of-bangabandhu-sheikh-mujibur-rahman/ [Retrived on 23 July 2019].

৪. সিদ্দিকী, মুহম্মদ জেএ (২০১৭), বঙ্গবন্ধু, বাকশাল ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫. বিশ্বাস, বোরহান (২০১৭), গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ১৫ই আগস্টের আগে ও পরে..., নিরীক্ষা, সংখ্যা ২১৪, আগস্ট ২০১৭।

৬. ভৌমিক, রীতা (২০১৮). বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রতিফলন, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২১৯, আগস্ট ২০১৮।

৭. পিআইবি (২০১৩), বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পৃ. ১৬৩।

৮. Chowdhury, Abdul Gaffar (2019), A conspiracy, not controversy, The Independent, June 9, 2019.

৯. রহমান, মেজর জেনারেল জিয়াউর (১৯৭২), একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭২ এবং পুনঃপ্রকাশিত বিচিত্রা, ২৬ মার্চ ১৯৭৪।

১০. বাগচী, অ্যালভীন দীলিপ (২০১৯), বাংলার স্থপতি, ৫ম খণ্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. মোহাম্মদ, বেলাল (২০০৩), স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, চতুর্থ সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ৪০-৪১।

১২. মনসুর, সুজাত বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব, পৃ. ১২৭।

১৩. সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, মেঘের আড়ালে সূর্য।

১৪. Wolpert, Stanley (1993), Zulfi Bhutto of Pakistan, Oxford University Press.

১৫. Liton, Shakhawat (2016), National Mourning Day today: Shame darker than the night, [Online], Available at https://www.thedailystar.net/frontpage/shame-darker-the-night-1270021 [Retrived on 2 August 2022].

১৬. Chowdhury, Dr. Khurshed Alam (2007), Why Sheikh Mujibur Rahman deserves to be the Father of Nation of Bangladesh: A factual Review! [Online]. Available at https://www.bangabandhu.com.bd/2010/11/13/why-sheikh-mujibur-rahman-deserves-to-be-the-father-of-nation-of-bangladesh-a-factual-review/ [Retrieved on 25 July 2019].

লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি

১৯৭১: বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার প্রক্রিয়ার সংবাদ

মো. মিনহাজ উদ্দীন

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট–মাত্র ৫৫ বছরের জীবন। কালের পরিক্রমায় স্বল্প সময়ের এই জীবনেই বাঙালি জাতির হাজার বছরের স্বপ্ন, স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন একজন শেখ মুজিবুর রহমান। যে দুর্গম অভিযাত্রায় ছোট্ট জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাবাস করতে হয়েছিল একজন মুজিবকে। বছরের হিসাবে যা এক যুগের বেশি সময়। একবার ভাবুন তো, ৫৫ বছরের জীবনের মধ্যে ১২ বছরের অধিক সময় কারাগারে! একজন শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু', বাঙালির 'জাতির পিতা' তো আর এমনি এমনি হননি। একটি মানচিত্রের জন্য, একটি পতাকার জন্য তাঁর মতো ত্যাগ কি আর কেউ স্বীকার করেছেন। একবার ভেবে দেখতে পারেন।

ছোট্ট এই জীবনে অন্যায়ের প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, দীর্ঘ বিষণ্ন জেলজীবন, আদালতের জটিল-কুটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারকে। কখনো বিনা কারণে কারারুদ্ধ হয়েছেন আবার সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে কারাগার থেকে বাড়ি ফেরার পথে নতুন করে আটক হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ভাষায়:

> 'স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা-বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' (রহমান: ২০১৭; ১৬)

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বঙ্গবন্ধু প্রথম কারারুদ্ধ হয়েছিলেন ব্রিটিশ আমলে। ১৯৪০ সালে সরকারি বিধিনিষেধ ভেঙে বক্তব্য দেওয়ায় তাঁকে আটক করা হয়েছিল। কারাবাস সাত দিনের। এরপর পাকিস্তান আমলের প্রায় পুরো সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে বারবার কারাগারে যেতে

হয়েছে। ২০১৭ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদে দেওয়া এক ভাষণে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব কারাগারে ছিলেন ৪ হাজার ৬৭৫ দিন (৭ মার্চ, ২০১৭, প্রথম আলো, অনলাইন)। বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরসংগ্রামী জীবনে শেষবারের মতো আটক হয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে। রাজনৈতিক জীবনে শেষবারের মতো আটক হওয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর প্রহসনের বিচার প্রক্রিয়া নিয়েই এই নিবন্ধের আলোচনা।

অপারেশন সার্চলাইটের অংশ হিসাবে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা হানা দেয় রাত ১টার (২৬ মার্চের প্রথম ঘণ্টা) দিকে। আধা ঘণ্টার এক ঝটিকা অভিযানে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৭ ব্রিগেডের একটি দল। শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক অভিযানের মূল দায়িত্বে ছিল ব্রিগেডিয়ার জেডএ খানের ওপর। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান সেনা স্টাফ কর্মকর্তা জেনারেল আবদুল হামিদ খান তাকে বিশেষভাবে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের পর ৫৭ ব্রিগেডের মেজর জাফর ওয়্যারলেসে বার্তা দেয় 'Big bird in the cage...others not in their nests...over'. (Salik; 1997:75)

৩২ নম্বর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে নেওয়া হয় জাতীয় পরিষদ ভবনে (বর্তমান সংসদ ভবন, ১৯৭১ সালে নির্মাণাধীন)। সেখানে অল্পকিছু সময় রাখার পর ভোরের আলো ফোটার আগেই বঙ্গবন্ধুকে নেওয়া হয় ঢাকা সেনানিবাসের আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলসংলগ্ন একটি কক্ষে। সেখান থেকে পরদিন (২৭ মার্চ ১৯৭১) স্থানান্তর করা হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজে। সেখান থেকে ৩১ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে নেওয়া হয় করাচিতে। এরপর বেশ কিছুদিন শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ। এদিকে ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ঢাকার বুকে ঘৃণ্য গণহত্যা চালানোর পর ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইয়াহিয়া খান। যাতে অযৌক্তিকভাবে পাকিস্তানের সংকটের জন্য একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করা হয়। ওই ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান বলেন:

> 'Sheikh Mujibur Rahman's action of starting his non cooperation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks they have insulted Pakistan's flag and defiled the photograph of the Father of the nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.' (ত্রিবেদী; ২০১২:৬৬৪)

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ভাষণেই ইয়াহিয়া খান পুরো পাকিস্তানে সব শেষ নির্বাচনে (১৯৭০) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে জারি করা হয় কড়া প্রেস সেন্সরশিপ। এদিকে বাংলাদেশের বুকে নৃশংস গণহত্যা চালানোর পর শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। যার ফলে ক্রমাগত আন্তর্জাতিক চাপে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। ১০ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদপত্র *দ্য ডন* শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রকাশ করে। তবে এই সংবাদে মুজিবকে নিয়ে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করা হয়নি।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারে ইয়াহিয়ার হুংকার

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর দুইবার প্রকাশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের হবু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন ইয়াহিয়া খান। তবে তার মনে ছিল ভিন্ন পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছিল ভুট্টোর লারকানার জমিদার বাড়িতে। প্রথম দফায় মধ্য জানুয়ারিতে ঢাকার এসেছিলেন ইয়াহিয়া। সেসময় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শাসনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর ঢাকা থেকে ইয়াহিয়া সরাসরি চলে যান লারকানায়। সেখানে ইয়াহিয়া-ভুট্টো শীর্ষ সেনা কর্তাদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই বাঙালি তথা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত হয় শক্তি প্রয়োগের। এই ঘটনাপ্রবাহ ইতিহাসে 'লারকানা হাঁস শিকার ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। এরপর শুধুই কালক্ষেপণ। ১৫ মার্চ আবার ঢাকায় আসেন ইয়াহিয়া। শুরু হয় আলোচনা। এদিকে দলে দলে সেনা আসতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে। আসে অস্ত্রশস্ত্র। আলোচনার মধ্যেই ১৮ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট'-

এর অনুমোদন দেন ইয়াহিয়া। সেনা আক্রমণের সব প্রস্তুতি শেষ হলে ২৫ মার্চ বিকালে অনেকটা লুকিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে প্রস্তুত হয় পাকিস্তানের খুনপিয়াসী আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিমানে আকাশে থাকা অবস্থায়ই ঢাকার বুকে শুরু হওয়া গণহত্যার খবর পান ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১: পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনের বিচার	
২৬ মার্চ, ১৯৭১	অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আটক।
পশ্চিম পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু	কয়েকদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক রাখার পর ৩১ মার্চ করাচি স্থানান্তর।
কারাগার	পাঞ্জাব প্রদেশের লায়ালপুর (বর্তমানে ফয়সালাবাদ) কারাগারে বন্দি।
বিচার প্রক্রিয়া শুরু	কারাগারসংলগ্ন একটি ভবনে বিচার শুরু হয় ১১ আগস্ট ১৯৭১।
বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী	বঙ্গবন্ধু আইনজীবী হিসাবে ড. কামাল হোসেনকে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষের আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ পান সিন্ধুপ্রদেশের আইনজীবী এ কে ব্রোহি।
মামলার সাক্ষী	১০৫ জন। বিচার প্রক্রিয়ায় অর্ধেকের মতো সাক্ষী আদালতে হাজির হন।
প্রধান অভিযোগ	১২ ধরনের অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন। যার মধ্যে ৬টি ছিল গুরুতর শাস্তিযোগ্য। প্রধান অভিযোগ: পাকিস্তানে যুদ্ধ বাধানো।
মামলা সমাপ্ত	এক বিবৃতিতে ১৮ ডিসেম্বর এই বিচারের প্রক্রিয়া সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ভুট্টোর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ	১৬ ডিসেম্বর লজ্জাজনক পরাজয়ের পর পদত্যাগ করে ইয়াহিয়া খান। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ রাষ্ট্রপতি হন জুলফিকার আলী ভুট্টো। দায়িত্ব নিয়ে শেখ মুজিবকে একটি অতিথিশালায় স্থানান্তর এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করতে যান ভুট্টো।
৭ জানুয়ারি ১৯৭১	মুক্ত মুজিবের পাকিস্তান থেকে লন্ডনযাত্রা।
৮ জানুয়ারি ১৯৭১	লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১০ জানুয়ারি	ব্রিটিশ বিমানে করে দিল্লিতে অবতরণ। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১০ জানুয়ারি	বিকাল ৩টার দিকে স্বপ্নের স্বদেশে বঙ্গবন্ধু।

তথ্যসূত্র

* রহমান, শেখ মুজিব (২০১৮), কারাগারের রোজনামচা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
* মামুন, মুনতাসির (২০১৬), *বঙ্গবন্ধু, ৭ই মার্চ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস ।
* Hossain, Kamal (2013), *BANGLADESH Quest for freedom and Justice*, Dhaka: UPL

পরদিন আনুষ্ঠানিক ভাষণে সবকিছুর জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়ী করেন ইয়াহিয়া। তবে তিনি খুব দ্রুত শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার সাহস পাননি। শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে গণমাধ্যমে প্রথম খবর আসে ক্র্যাকডাউনের পাঁচ মাস পর আগস্টে। ৩ আগস্ট ইয়াহিয়া খানের এক টেলিভিশন ভাষণের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে *দ্য ডন*। যার শিরোনামে বলা হয়: 'Mujib will be put on trail.' ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট প্রকাশিত ওই সংবাদে ইয়াহিয়া খানের বরাত দিয়ে বলা হয়:

> 'President Agha Mohammad Yahya Khan has said that Sheikh Mujibur Rahman, leader of the defunct Awami League, would be put on trail. He said Sheikh Mujib was arrested for committing acts of treason and he would be dealt with under the law of the land. In a television interview telecast from all stations of Pakistan Television Corporation last night, the President said that being a citizen of Pakistan he should be dealt with according to the law of Pakistan. The President, who was asked what would be the fate of Sheikh Mujibur Rahman, said that the leader of the defunct Awami League had deviated from his electoral campaign in which he demanded autonomy for East Pakistan.' (August 5, 1971, The dawn)

এই সংবাদে আরও বলা হয়:

> "The President said he was sorry for what Sheikh Mujibur Rahman had done for which he would suffer like any other person committing crimes on the nation would suffer. 'How would you treat your criminal', he posed a question to the foreign news media representatives present at the interview." (August 5, 1971, The dawn)

এই সংবাদের ভাষ্য অনুযায়ী পাকিস্তানের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক নেতাকে দেশদ্রোহিতার (acts of treason) অভিযোগে অভিযুক্ত করে ইয়াহিয়া। একই সঙ্গে পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করারও হুমকি দেন। ওই সংবাদভাষ্য অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান একজন অপরাধী। যাঁর বিচার পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হবেই।

যুদ্ধ বাধানোর অপরাধে বিচার!

জাতির পিতার প্রহসনের বিচার নিয়ে ইয়াহিয়া খান মুখ খোলার পর থেকেই এ সংক্রান্ত আরও তথ্য গণমাধ্যমে আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর বিচার নিয়ে পাকিস্তান সরকার একটি প্রেস নোট (Official Press Note) প্রকাশ করে ৯ আগস্ট। যার ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশিত হয় ১০ আগস্ট। দ্য ডনের ওই দিনের এ সংক্রান্ত সংবাদের শিরোনাম ছিল: Trail for "waging war against pakistan". যে সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়:

> 'Sheikh Mujibur Rahman, President of the defunct Awami League, will be tried by a Special Military Court for "waging war against Pakistan" and other

offences, a Press Note issued by the Headquarters of the Chief Martial Law Administrator said today (August 9). The trail will commence on August 11 in camera and its proceedings will be secret, the Press Note said. The Accused will be given proper opportunity to prepare his defence and will be provided with all facilities permitted in law including engaging a counsel of his own choice provided such a counsel is a citizen of Pakistan, it added.' (August 10, 1971, The dawn)

এই সংবাদের ভাষ্য অনুযায়ী, পাকিস্তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানোর অভিযোগে (!) শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হচ্ছে। যে বিচার প্রক্রিয়া হবে কঠোর গোপনীয়তায়, বিশেষ সামরিক আদালতে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই সংবাদে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে আইন অনুযায়ী সব ধরনের সুযোগ দেওয়া হবে। প্রকাশ্য সংবাদে আইন অনুযায়ী সবকিছু হবে এমন কথা বলা হলেও এ কথা বুঝতে কারও বাকি ছিল না যে, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ একটি প্রহসনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্‌বেগের তীব্র বিরোধিতা, প্রতিবেশীর ষড়যন্ত্র সন্ধান!

পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনের বিচারের খবরে বসে থাকেনি বিশ্বসম্প্রদায়। পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক বিচারের খবর প্রকাশের পরপরই এ বিষয়ে বিবৃতি দেন জাতিংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্ট (মিয়ানমারের নাগরিক)। যদিও এই বিবৃতির কড়া প্রতিবাদ জানায় পাকিস্তান। এই বিচার প্রক্রিয়াকে তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে গণ্য করে। একই সঙ্গে এমন বিবৃতি প্রকাশের পেছনে তারা ভারতের ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। এ বিষয়ে ১৬ আগস্ট একটি সংবাদ প্রকাশ করে দ্য ডন। 'Text of Pakistan's protest note against u.n. secretary general's statement at Sheikh Mujib's trail' শিরোনামের ওই সংবাদে বলা হয়:

'Our Regret is sharpened by the awareness that in numerous cases of trials, even imprisonment without trial and sentences after summary trials of political leaders in various countries, no expression of feelings about their repercussions was ever made on behalf of the U.N. The Government of Pakistan cannot accept the proposition that any judicial decision on the individual case of Sheikh Mujibur Rahman will have any repercussions outside the borders of Pakistan. No such repercussions are inevitable unless Pakistan's hostile neighbor, India, is encouraged to make them so.' (August 16, 1971, The dawn)

ভারত উৎসাহ দিয়েছে এমন বিবৃতি দিতে! অভ্যন্তরীণ যে কোনো সংকটে ভারতকে দায়ী করার অভ্যাস তখনও ত্যাগ করতে পারেনি

পূর্ব পাকিস্তানে কোনো গণহত্যা হয়নি, সবকিছুই স্বাভাবিক, স্থিতি ও শান্তি বিরাজমান–পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ এমন বক্তব্য দিলেও তা ছিল সত্যের অপলাপ। বিশ্বের গণমাধ্যম ও গণমানুষ তাদের এই প্রচারণা বিশ্বাস করেনি

পাকিস্তান। মুজিবের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে জাতিসংঘ বিবৃতি দিলে তাতেও ভারতীয় ষড়যন্ত্র খুঁজে পায় পাকিস্তানিরা।

গোপন বিচার বন্ধ কর, মুজিবকে মুক্তি দাও

পূর্ব পাকিস্তানে কোনো গণহত্যা হয়নি, সবকিছুই স্বাভাবিক, স্থিতি ও শান্তি বিরাজমান–পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ এমন বক্তব্য দিলেও তা ছিল সত্যের অপলাপ। বিশ্বের গণমাধ্যম ও গণমানুষ তাদের এই প্রচারণা বিশ্বাস করেনি। ১৯৭১ সালে বিশ্বজনমত ছিল বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। তারই একটি প্রতিফলন পাওয়া যায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার নিয়ে ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড প্রেস কাউন্সিলের (World Press Council) একটি বিবৃতিতে। সংস্থাটি ২০ আগস্ট 'Stop secret trial: release sheikh mujibur rahman' শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, যা পরের দিন বিশ্ব গণমাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বিবৃতিতে বলা হয়:

> 'In complete defiance of all norms of human behavior, and in utter disregard of world-wide public opinion, the Government of Yahya Khan in Pakistan is putting to trial Sheikh Mujibur Rahman, the chosen leader of the people of East Pakistan (Bangla Desh). The trial is being held secretly, and no one knows what in being perpetrated by the militarist rules of Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman allegedly is being tried for "waging war against Pakistan". This, in fact, is a terminology taken over from British imperialist rules of India in the old colonial days when hundreds of Indian patriots and freedom-fighters were tried, but not in secret, for "waging war against the King-Emperor," and hanged.' (Bangladesh Documents; 1999 : 30)

এই বিবৃতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বিচারের আওতায় আনার নিন্দা জানানো হয়। একই সঙ্গে সমালোচনা উঠে আসে গোপন বিচারের। 'যুদ্ধ বাধানোর' যে অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের কথা বলা হয়, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রতিফলন হয় বলে উল্লেখ করা হয় ওই বিবৃতিতে। অত্যন্ত সুলিখিত ও বিস্তারিত ওই সংবাদবিবরণীতে আরও উল্লেখ করা হয়:

> 'In this, as in all their other actions of massacre and pillage, the Yahya Khan dictatorship has revealed itself to the world as imitators imperialists and autocrats who have nothing but contempt for the people. The only fault of Sheikh Mujibur Rahman, who also fought against British alien rulers of India while Yahya Khan and his henchmen were loyally serving the British masters, is that the people of Bangla Desh gave his party 167 seats out of 169 in the first-ever general election held in Pakistan. By all norms of democratic practice, Sheikh Mujibur Rahman should today be the Prime Minister of Pakistan. The Yahya Khan bureaucratic-military-feudal clique is, however, not prepared to part with power and bow to the clearly expressed people's verdict. And so, perpetrating an outrage on every concept of national behaviour or international law, Sheikh Mujibur Rahman is being tried secretly to satisfy the power-lust of a narrow clique which is hurling defiance at the people of Bangla Desh who have already been massacred in hundreds of thousands.' (Bangladesh Documents; 1999 : 30)

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাঁরই আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সেনানির্ভর আমলাতন্ত্র তা হতে দেয়নি। তারা জনগণের রায়কে পদদলিত করেছে। এই সংবাদবিবরণীর পরের দিকে বলা হয়, গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে এই সংকটের একমাত্র সমাধান 'বাংলাদেশ'। এই প্রহসনের বিচার প্রক্রিয়া শেষে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেওয়া হলে তাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে বলেও হুঁশিয়ার করা হয় ওই বিবৃতিতে, যা পরের দিন দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

মধ্য সেপ্টেম্বরে শেষ হবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রক্রিয়া

শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে সেনা কর্তৃপক্ষের তাড়াহুড়া ছিল। সবকিছুই ঘটছিল অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে। বিশ্বব্যাপী এই বিচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি হতে থাকায় ইয়াহিয়া খান যত দ্রুত সম্ভব বিচার শেষ করতে চাচ্ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১ সেপ্টেম্বর

প্রকাশিত একটি সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, আগামী দুই সপ্তাহ অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেখ মুজিবের বিচার শেষ হবে। এ বিষয়ে ডেইলি নিউজ (Daily news) 'Mujib's trail to be over in another two weeks' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল। রাষ্ট্রদূত আগা শাহীর বরাত দিয়ে ওই সংবাদে আরও বলা হয়:

> 'Pakistan Ambassador Agha Shahi yesterday (August 31) informed Secretary General U-Thant about new steps contemplated by the Pakistan Government to build confidence in the country. He told correspondents in New York afterwards "as you know, the President of Pakistan has taken many steps to build confidence and further steps are contemplated in this direction." He said they would take place "within the next two or three weeks". Questioned about the trail of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League in East Pakistan, Mr. Shahi said his trail started August 11 and should be over in another two weeks.' (September 1, 1971, Daily news)

ওই সংবাদে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার কোথায় হচ্ছে, তা উল্লেখ করেননি আগা শাহী। তবে তিনি দাবি করেছেন শেখ মুজিবুর রহমানকে পছন্দমতো আইনজীবী দেওয়া হয়েছে।

'পাকিস্তানের শত্রু'! ও 'বিদ্রোহী'! মুজিবের সঙ্গে আলোচনা নয়

গোটা রাজনৈতিক জীবনেই পাকিস্তানের শত্রু ও ভারতের চরসহ নানা অভিধায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আখ্যায়িত করেছে পাকিস্তানি সেনা

কর্তৃপক্ষ। পশ্চিম পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া চলার সময়ও যা বহাল ছিল। ১ সেপ্টেম্বর প্যারিসভিত্তিক সংবাদপত্র লা ফিগারোতে (Le Figaro) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান উল্লেখ করেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের জনগণের শত্রু। সে আমার ব্যক্তিগত শত্রু নয়।' ইয়াহিয়া খানের এই প্রলাপ শুনে ওই সময় সবাই মুচকি হেসেছেন। নির্বাচনে গণরায় পাওয়া গণতান্ত্রিক পন্থায় আস্থা রাখা শেখ মুজিব জনগণের শত্রু!

এদিকে ১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর প্যারিসের আরেকটি সংবাদপত্র লা মনডে (Le Monde) ইয়াহিয়া খানের আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। এই সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান ইয়াহিয়া খান। ওই সংবাদপত্রের এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, 'Once again, I cannot speak with a rebel unless the court martial charged with judging him finds him not guilty. But above all it is up to him to convince that he has not acted against national interests.' (October 20, Le Monde)

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা চূড়ান্ত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, পাকিস্তানের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পন্ন করতে বেশ তাড়াহুড়া ছিল সেনা কর্তৃপক্ষের। যে কারণে সবকিছুই চলছিল দ্রুততার সঙ্গে। শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের রায় চূড়ান্তকরণের বিষয়গুলো সামনে আসে একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিল রয়টার্স। পাকিস্তানের উর্দু ভাষার সংবাদপত্র 'ইমরোজ' (ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র)-এর বরাত দিয়ে প্রকাশিত ওই সংবাদের শিরোনাম ছিল 'Report ready on Mujib', যাতে বলা হয়:

> "The special military tribunal set up to try Sheikh Mujibur Rahman on treason charges had completed its investigations and would shortly submit its report to President Yahya Khan, the Urdu language newspaper 'Imroze' reported today (September 17). Sheikh Mujib, leader of the outlawed Awami League, has been under detention since 25 March when the army cracked down on East Bengal. 'Imroze' which is managed by the Government-sponsored National Press Trust quoting well-informed sources said Sheikh Mujib was being given special treatment and that a Government doctor examined him daily. 'Imroze' said Sheikh Mujib had two attendants. He received all the national newspapers daily, but on one was allowed to visit him." (September 17, 1971; Reuter)

অনুসন্ধান শেষ, অভিযোগনামা চূড়ান্ত, যা দ্রুতই পেশ করা হবে ইয়াহিয়া খানের কাছে। তারপর আরও কিছু প্রহসনের প্রক্রিয়া। এরপর ফাঁসি। এমন পরিকল্পনা নিয়েই সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল ইয়াহিয়াচক্র। যার সংবাদ উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়।

মুজিবের মুক্তি কামনা ৪২ জন পশ্চিম পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীর

বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার যেমন চলছিল, ঠিক তেমনই এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁকে নিয়ে নানা মহলে উদ্‌বেগ বাড়ছিল। শুভবুদ্ধির সব মানুষই

জানতেন, শেখ মুজিবুর রহমানের যে কোনো দণ্ড ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে। আর তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান হতে পারে। এমন বাস্তবতায় নভেম্বরে সক্রিয় হন পাকিস্তানের ৪২ জন বুদ্ধিজীবী। তারা সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিবিদ, শ্রমিকনেতা, সাহিত্যিক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা, সমাজকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজের সুধীজনরা। শেখ মুজিবের মুক্তি কামনা করা এই ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ইশতেক লাল পার্টির প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান ও লেনিন শান্তি পুরস্কার পাওয়া কবি ফাইয়াজ আহমেদ ফাইয়াজ। তাঁদের বিবৃতি সংবলিত এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বর। রয়টার্সের বরাত দিয়ে প্রকাশিত ওই সংবাদের শিরোনাম ছিল 'Pakistani leaders' call for sheikh's release', যাতে বলা হয়:

> 'Forty-two Pakistani political leaders, trade unionists, lawyers, journalists, writers, student leaders, social workers and university professors yesterday (November 4) appealed to President Yahya Khan for the immediate release of Sheikh Mujibur Rahman. The signatories, who include the leader of the Istiqlal Party, fromer Air Marshal Asghar Kha, and Lenin Peace Prize winning poet, Faiz Ahmed Faiz, said the constitution of a democratic Government was the best way to end the crisis threatening Pakistan's political and economic stability.' (November 5, 1971, Rauter)

বামপন্থি ধারায় বিশ্বাসী এই ৪২ জন বুদ্ধিজীবীর এ বিবৃতির পেছনে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল। কারণ এর বেশ কিছুদিন আগেই রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান 'নিউজউইক'-এ একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, যদি জাতি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি চায়, তাহলে সে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত ওই বিবৃতিভিত্তিক সংবাদে আরও বলা হয়:

> "The signatories said they were appealing to the President in the light of his recent interview with the 'Newsweek' magazine which quoted him as saying he would be prepared to release Sheikh Mujib if the nation Demand it.The statement said the best way to end the grave political crisis threatening Pakistan's political and economic stability would be to establish a democratic Government. Such a Government could be constituted by the representatives of the people who were elected in the country's first general election last December. The majority of the signatories are left-wingers and the appeal are the first of its kind to be made to the President in Lahore, considered to be the biggest anti-Mujib Centre in Pakistan." (November 5, 1971, Rauter)

পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোর অঞ্চলটি ছিল কট্টর মুজিববিরোধী এলাকা। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের লাহোর সফরের আগে এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সামরিক জান্তা সরকার তাদের এই আবেদনে কর্ণপাত না করলেও এই বিবৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই বিবৃতি ঐতিহাসিকভাবেও অমূল্য। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি চেয়ে এই ধরনের আবেদন সত্যিই অনন্য, অসাধারণ ঘটনা।

মুজিবের বিচার সমাপ্ত

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের সঙ্গে স্বল্প সময়ের সর্বাত্মক যুদ্ধে কুপোকাত হয় পাকিস্তানি সেনারা। দুই ফ্রন্টে ব্যাপক মার খেয়ে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার মানুষের সামনে আত্মসমর্পণ করে টাইগার (!) নিয়াজী। নির্লজ্জ নিয়াজী অস্ত্র সমর্পণ করে কাতর কণ্ঠে যৌথ কমান্ডের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সেই সুযোগও পেয়েছিল বর্বর পাকিস্তানিরা।

এদিকে তখনও কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান। তবে এমন পরিস্থিতিতে তাঁর বিচার আর এগিয়ে নেওয়ার সাহস পায়নি সেনা কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে ১৮ ডিসেম্বর এই বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত ঘোষণা করে পাকিস্তান। 'Mujib's trial over' ইউপিআই-এর খবরে বলা হয়:

> "The treason trail of Sheikh Mujibur Rahman has ended, but no verdict has yet been handed down, a Government spokesman said to-day (December 18). The Awami League leader, who was arrested in the Pakistan Army crackdown in Bangla Desh on March 25, is still prison in Lyallpur, south-west of here (Islamabad). The spokesman said: 'The trial has ended. All the witnesses have been examined. But I cannot say how soon the verdict will be.' 'The verdict may be soon or it may be at the end of the month,' he said when pressed for a date. Mujib trial by a military tribunal was not open to the public." (December 18, 1971, UPI)

মামলার কার্যক্রম শেষ। কবে রায়? পাকিস্তানি মুখপাত্রের তথ্য অনুযায়ী হয়তো এ মাসের শেষদিকে। না, সেই সাহস আর দেখাতে পারেনি ইয়াহিয়া খান। রায় আর ঘোষিতও হয়নি। বরং প্রবল গণরোষে পদচ্যুত হন বেসামাল ইয়াহিয়া খান। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী, চতুর ভুট্টো ক্ষমতায় এসেই শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করেন। ২৮ ডিসেম্বর সিহালা রেস্টহাউজে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন ভুট্টো। কাতর কণ্ঠে যে কোনো কাঠামোতে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার আবেদন জানান বঙ্গবন্ধুর কাছে। সেসময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকা ড. কামাল হোসেন লেখককে জানিয়েছেন, নামকাওয়াস্তে হলেও পাকিস্তান টিকিয়ে রাখতে শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের পা ধরা বাকি রেখেছিল ভুট্টো। এরপর ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি মধ্যরাতের পর পাকিস্তান থেকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব ফেরেন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ভালোবাসার শক্তি পরিচয়

রেজা সেলিম

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের কাছে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টেলিভিশন চ্যানেলে 'ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রচারিত সাক্ষাৎকারটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে এযাবৎকাল বিবেচিত হয়ে এসেছে। পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে এসে পৌঁছানোর মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় বঙ্গবন্ধু ও ডেভিড ফ্রস্টের এই কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, দর্শন এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। সেসময়ের ৫২ বছর বয়সি বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে যে গভীর দেশপ্রেমের রাজনীতি করেছেন, তার একটি পরিণত রূপ দেখে ডেভিড ফ্রস্ট নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলেন; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে ইতিহাসদীক্ষা এই সাক্ষাৎকারের পরতে পরতে রয়েছে, এর অন্তর্গত অনুসন্ধান বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে প্রজন্মান্তর উৎসাহিত করবে।

ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রথমেই জানতে চান কেন তিনি ২৫ মার্চ সবরকম আশঙ্কার খবর জেনেশুনেও বাড়িতেই ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি পাকিস্তানি সামরিক কমান্ডোরা ঘিরে রেখেছিল, বঙ্গবন্ধু উত্তরে বলছেন, 'তারা চেয়েছিল আমি বাড়ির বাইরে এলেই আমাকে হত্যা করবে। এতে তারা বিশ্বের কাছে প্রচার করত যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমাদের আপস আলোচনা চলছে; কিন্তু তাঁর নিজের দলের চরমপন্থিরা তাঁকে মেরে ফেলেছে ফলে ইয়াহিয়া খানের এখন ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এটা ছিল তাদের প্রাথমিক চিন্তা। আমি জানতাম, তারা নিষ্ঠুর ও অসভ্য প্রকৃতির, তারা আমার মানুষদের হত্যা করবে। আমি ভাবলাম আমি মরি তা-ও ভালো; কিন্তু আমার দেশবাসী রক্ষা পাক যারা আমাকে এত ভালোবাসে।' কেন কলকাতা বা দেশ ছেড়ে আর কোথাও গেলেন না, এর প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি যেতে চাইলে যে কোনো স্থানেই যেতে পারতাম; কিন্তু আমি দেশের

মানুষের নেতা, আমি তো তাদের প্রতিরোধ করার ডাক দিয়ে রেখেছি, আমি কেমন করে তাদের ছেড়ে যাই?'

২৫ মার্চ রাত দেড়টার দিকে বঙ্গবন্ধুর ৩২নং বাড়ির চতুর্দিকে গুলিবর্ষণ করতে করতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি দল তাঁকে গ্রেফতার বা হত্যার জন্য এগিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু তাঁর শোয়ার ঘরে ছিলেন, সেখানেও গুলি এসে পড়ে। বঙ্গবন্ধু সে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছেন ডেভিড ফ্রস্টের কাছে, 'আমার ছয় বছরের শিশুসন্তানটি ঘুমিয়ে ছিল, আমার স্ত্রীকে দুই সন্তান নিয়ে ঘরে বসে থাকতে বলে বিদায় নিয়ে আমি দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে এলাম। সামরিক লোকদের উদ্দেশে আমি বললাম, 'গুলি থামাও, কী চাও তোমরা? কেন গুলি করছ? তারা চারদিক থেকে ঘিরে আমাকে বেয়নেট চার্জ করতে উদ্যত হলে একজন অফিসার বাধা দিয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল আর অন্যদের উদ্দেশে বলতে লাগল আমাকে যেন মারা না হয়। তখন পেছন থেকে সেনাদের কেউ কেউ আমার পিঠে ও পায়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করছিল ও ধাক্কা দিচ্ছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম, আমাকে যেন ধাক্কা দেওয়া না হয় এবং আমার পাইপ আনতে যেতে দিতে বললাম, বা তারা যেন আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তা নিয়ে আসে। আমি পাইপ আনতে গিয়ে দেখলাম আমার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমাকে পাইপ ও একটা ছোটো সুটকেস হাতে তুলে দিলেন।' বন্দি বঙ্গবন্ধু যাওয়ার পথে পথে দেখলেন চারিদিকে আগুন জ্বলছে। জানালেন, 'আমি এই বাড়িতে আর ফিরে আসব কি না জানতাম না; কিন্তু একটা কথা মনে ছিল যে যদি মরি মাথা উঁচু করেই মরব যেন আমার দেশের মানুষকে লজ্জা পেতে না হয় যে আমাদের নেতা আত্মসমর্পণ করেছে এই ভেবে। তাহলে তারা দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাতে পারত না।' বঙ্গবন্ধু ফ্রস্টের কাছে আরও উল্লেখ করলেন, 'I told them that a man who is ready to die, nobody can kill him. You can kill a man physically, but can you kill a man's soul? You can't, it's my faith. I'm a Mussalman and a Mussalman dies only once, not twice, I'm a human being. I love humanity. I'm a leader of this nation, and my people love me and I love them. There is nothing I expect from them now. They have given everything for me because I was ready to give everything for them. I want to make them free. I have no objection to die. I want to see them happy. I become emotional when I feel the love and affection my people gave me.' এর মানে দেশের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত বঙ্গবন্ধু মৃত্যুভয়ে কখনো শঙ্কিত ছিলেন না।

২৫ মার্চ রাতে ৩২নং বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একই কায়দায় গুলি ছুড়তে ছুড়তে কাপুরুষ হত্যাকারীরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘিরে ফেলে। একই কায়দায় বঙ্গবন্ধু ঘরে থেকে বের হয়ে হুংকার দিয়ে জানতে চান, 'কে তোরা, কী চাস?' শুধু পার্থক্য এই যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা যা পারেনি, বাংলাদেশের কতিপয় ঘাতক তা পেরেছে। বঙ্গবন্ধুর বুকের ওপর গুলি চালিয়ে দিতে পেরেছে। হত্যাকারীরা বাংলাদেশেরই মানুষ, যে দেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধু ভালোবেসে তাঁর সারা জীবনের রাজনীতি করেছেন এবং যে দেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মায়া ও বিশ্বাস। নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় থাকতে হবে–এমন চিন্তা এই মানুষটি কস্মিনকালেও করেননি। কারণ, তিনি জানতেন এই দেশের মানুষ কখনই তাঁকে মারতে পারে না। ডেভিড ফ্রস্টের কাছেই তিনি বলেছিলেন, 'আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমি দেশের মানুষকে ভালোবাসি, আর আমার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।'

সেই ভালোবাসার প্রতিদান স্বাধীন বাংলাদেশের কিছু অসভ্য ও বর্বর প্রকৃতির লোকের হাতে কলঙ্কিত হয়েছে; কিন্তু এ কথাও সত্যি যে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাকে ভালোবেসে এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ১৯৭১ সালে জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। ৩০ লাখ মানুষ অকাতরে জীবন দিয়েছে, ২ লাখ মা-বোনকে নির্মম পৈশাচিকতার শিকার হতে হয়েছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানিরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরও পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে, শত-সহস্র মানুষ গৃহহারা হয়েছে, আপনজন হারিয়েছে। বঙ্গবন্ধু জানতেন এই পাকিস্তানিরা কত ভয়ংকর। তাই ডেভিড ফ্রস্টের কাছে বলছেন, 'They are not human beings, they are criminals, they are fanatics, inhuman, uncivilized creatures... I've seen many human beings with human qualities, but I think the soldiers of West Pakistan are not human beings, they are worse than animals. People may have animal qualities, but people cannot be worse than animals. But these people are worse than animals, because an animal would kill a man attacking it, but not torture it. But they killed my people torturing them for 5 days, 7 days, 15 days.' এমনকি কথোপকথনের ফাঁকে ঘৃণাভরে ইয়াহিয়া খানকে তিনি 'ক্রিমিনাল' হিসাবে উল্লেখ করে কোনোদিন তার ছবি পর্যন্ত তিনি দেখতে চান না বলে জানান। ভুট্টোর বরাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু একটি তথ্য ডেভিড ফ্রস্টকে জানান যে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতার পালাবদলের সময়ে ভুট্টোকে বলেছিল, 'Mr. Bhutto, I've created the greatest blunder of not killing Sheikh Mujibur Rahman.'

ডেভিড ফ্রস্টের কাছে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকবার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেন। বিশেষ করে দেশের মানুষকে যুদ্ধাকালীন যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাচার, পৈশাচিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, সেসব কথা উল্লেখ করতে গিয়ে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রতি যে নির্মম অত্যাচার হয়েছে এবং বহু নেতাকর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তাদের কথাও তিনি নাম ধরে স্মরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীন বাংলাদেশের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তার নানারকম দিক উঠে এসেছে এই কথোপকথনে। যে কেউ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ইতিহাসের বহু বৈচিত্র্যরূপ তথ্যের সন্ধান পাবেন যদি তা অনুধাবনের চেষ্টা করেন আর বর্তমান সময়ে তা খুবই জরুরি। সত্যরূপে বঙ্গবন্ধুকে ভালো করে বুঝতে হলে যে অনুসন্ধান জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান হয়ে উঠছে–এ কথা একবাক্যে সবাই এখন স্বীকার করবেন। বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল পটভূমি ধারণ করে মানুষের মুক্তি আন্দোলনে বিশ্ব আসনে ঠাঁই পেয়েছেন–এমন নেতৃত্বের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'যথার্থ নেতৃত্বের সংজ্ঞা কী?' উত্তরে বঙ্গবন্ধু খুবই দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, 'যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আকস্মিকভাবে কেউ নেতা হতে পারে না, তাঁকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার থাকতে হবে আদর্শ, থাকতে হবে নীতি। কেবল এসব গুণাবলি থাকলেই কেউ নেতা হতে পারে।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ ও নীতিতে আজীবন অবিচল ছিলেন। সংগ্রামের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েই তিনি জাতির পিতার আসনে ঠাঁই পেয়েছেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং নিজের দেওয়া নেতৃত্বের সংজ্ঞায় তাঁর কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ছিল না, যে কারণে তিনি 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'র মর্যাদাও অর্জন করেছেন। এত বৈচিত্র্যময় গুণাবলি আর অর্জন কজন বাঙালির আছে?

লেখক: পরিচালক, আমাদের গ্রাম গবেষণা প্রকল্প

চাই আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন

অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিশ্ব ইতিহাসে এক ঘৃণ্য, নিষ্ঠুরতম ঘটনা। জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। যিনি সারা জীবন বাঙালি জাতির মুক্তি, স্বাধীনতা, সুন্দর-সমৃদ্ধ জীবনের জন্য ব্যয় করেছেন, তাঁকে সেই জাতির কতিপয় হিংস্র দানব নির্মমভাবে হত্যা করে। আর এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি জাতির স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। ব্যর্থ করে দিয়েছিল লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড আলোচনা এলেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল? এ নিয়ে গবেষণা চলছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত উপসংহারে পৌঁছানো যায়নি। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে বেশকিছু ধারণা পাওয়া গেছে। তবে এ নিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, এরকম হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি মসৃণ পথ তৈরির জন্য। যে ধারণাগুলো আমাদের মাঝে বিরাজ করছে সেগুলো হলো:

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা: বঙ্গবন্ধুই বিশ্বের একমাত্র নেতা, যিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। যতদিন তিনি স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করেননি, ততদিন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা নিলেও হত্যা করেনি। তিনি যদি আমাদের স্বাধীনতা না এনে দিতেন, তাহলে তাঁকে জেল-জুলুম-নির্যাতন করলেও হয়তো হত্যা করত না। এই স্বাধীনতা দেশের মোশতাক-জিয়া চক্র, পাকিস্তান এবং আরও কিছু আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই জাতির পিতাকে হত্যা করেছে। বাঙালির অধিকার, স্বাধীনতা না চেয়ে বঙ্গবন্ধু অনায়াসে হতে পারতেন মোনেম খানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। সত্তরের নির্বাচনের পর তিনি হতে পারতেন অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, অর্থ চাইলে ছয় দফার বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারতেন জেনারেল আইয়ুব খানের ব্ল্যাংক চেক, হতে পারতেন জেনারেল মোটরস কোম্পানির ৪৯ পারসেন্টের

মালিক এবং পূর্ব পাকিস্তানের সোল এজেন্ট। তাঁকে এসবের কিছুই দিতে পারেনি, কারণ তিনি কেবল চেয়েছেন বাঙালির স্বাধীনতা–বাংলার মানুষের সুখী-সমৃদ্ধ জীবন, যার জন্য তাঁকে বাঙালি জাতির জন্য সমগ্র জীবনের পরে প্রাণটাও দিতে হলো।

২. রাষ্ট্র পাকিস্তান: সাতচল্লিশে দেশবিভাগের পর থেকে এ রাষ্ট্রটি বাঙালিদের অধিকার অস্বীকার করে আসছিল। অবশেষে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকার এবং স্বাধীনতা আদায়ে চূড়ান্ত নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তান সরকার বারবার বাঙালিদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট নিয়ে পকিস্তানিদের প্রতারণা আর মিথ্যা আশ্বাসের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এই পাকিস্তান রাষ্ট্র আমাদের কখনো বন্ধু হবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমাদের প্রাপ্য অর্থসম্পদ প্রতারণা করে ফেরত দেইনি। বারবার তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তান বানাতে চেয়েছে। নানাভাবে জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে ১৯ বার হত্যা করার চেষ্টা করেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন কাজে তাদের দোসর রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধিতা করে যাচ্ছে, নানা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় পাকিস্তান বড়ো মদতদাতা এবং সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। যখনই সুযোগ পাবে, তখনই পাকিস্তান আমদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত করবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কর্মচারী: মুক্তিযুদ্ধকালীন কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মচারী পাকিস্তান রক্ষায় সরকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছে; কিন্তু স্বাধীনতার পরও তারা বহাল তবিয়তে ছিল। তাদের মানসিকতা ও অপরাধবোধ এবং প্রতিনিয়ত ধরা পড়ার শঙ্কায় ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারাও সুযোগের ব্যবহার করে। কিছুসংখ্যক পাকিস্তানফেরত কর্মচারী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

৪. পাকিস্তানফেরত সেনা সদস্য: স্বাধীনতার পর পাকিস্তানফেরত কিছুসংখ্যক সেনা সদস্য শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের নেতৃত্ব এবং অধিকার কোনোটি মেনে নিতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য দুটি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়, তাতে প্রত্যাগত সেনা সদস্যদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়।

ক্যান্টনমেন্টে এ দ্বন্দ্বটি তীব্র থেকে তীব্র করানো হয়। তাদের কেউ কেউ মদতদাতা হিসাবে কাজ করে।

৫. মুসলিম দেশের প্রতিক্রিয়া: কোনো কোনো মুসলিম দেশ তথাকথিত পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র ভেঙে যাওয়ায় নাখোশ হয়। তাদের অন্যায় ক্ষোভটি পড়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ওপর। বঙ্গবন্ধু অনেকটাই সামাল দিয়েছিলেন; কিন্তু ভুট্টোর কূটচালে কিছু কিছু দেশ বিভ্রান্ত হয়।

৬. জাসদের উত্থান: একটি গণতান্ত্রিক দেশে কিছু জনগোষ্ঠী একটি রাজনৈতিক দল করতেই পারে। মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে জাসদ গঠন করা হলেও দেশের মানুষের কাছে কিছু কারণে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (১) দলটিতে দলে দলে স্বাধীনতাবিরোধী শান্তি কমিটি-রাজাকার-আলবদর সদস্যরা ঢুকে পড়ে, (২) সদ্যস্বাধীন দেশে জাতির পিতার সরকারকে উৎখাত করে বিপ্লবী সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়, (৩) ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের অনেক নেতার মতেই হঠাৎ করেই পল্টন ময়দানের সভা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসা ঘেরাও কর্মসূচি দেওয়া হয় এবং মিছিল থেকে উসকানিমূলক গুলি ছোড়া হয় এবং (৪) একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেটি একেবারেই অনৈতিক। জাসদের এসব কর্মকাণ্ডে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়, যেখানে ষড়যন্ত্রকারীরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার সুযোগ পায়।

৭. সর্বহারা পার্টির অরাজকতা: সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টির নামে সাধারণ মানুষকে হত্যা, লুটপাট, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সরকারের কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়।

৮. আক্রোশ ও উচ্চাভিলাষ: কিছু কিছু সেনা সদস্য, আমলা ও রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ও উচ্চাভিলাষ ষড়যন্ত্রে বড়ো ভূমিকা রাখে।

৯. অপপ্রচার ও গুজব : ষড়যন্ত্রকারীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপপ্রচার ও মিথ্যা গুজবকে বড়ো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

১০. বঙ্গবন্ধুর বাঙালিদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও বিশ্বাস: বঙ্গবন্ধু ঘুণাক্ষরে চিন্তা করতে পারেননি যে কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করতে পারে। এক বিদেশি সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার কোয়ালিফিকেশন কী? তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন–'I love my people.' What is your disqualification? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'I love them too much.' যে কারণে অনেক সতর্ক করা সত্যেও তিনি তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেননি। বঙ্গবন্ধু যদি সেদিন এই অকৃত্রিম ভালোবাসা ও বিশ্বাস কিছুটা উপেক্ষা করে নিরাপত্তার বিষয়ে একটু নজর দিতেন, তাহলে জাতি পিতৃহারা হতো না এবং অল্প সময়ে বাংলাদেশ হতো বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ।

তাছাড়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ে বড়ো ধরনের প্রশ্ন রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআইএ-এর কথিত সম্পৃক্ততার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য একটি বইয়ের প্রণেতা মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ। ১৯৭৯ সালে তাঁর 'বাংলাদেশ: দি আনফিনিশড রেভুলিউশন' বইটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বের অধিকাংশ লেখক এ বিষয়ে তাঁকেই উদ্ধৃত করে থাকেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ দালিলিকভাবে প্রমাণিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তার বিশ্বাস ছিল না। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকেই সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থানের গুজব-গুঞ্জন ঢাকা, ইসলামাবাদ ও দিল্লির মার্কিন দূতাবাস এবং ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশ ডেস্ক কর্মকর্তাদের আলোচনার খোরাকে পরিণত হয়েছিল। কিসিঞ্জার নিবিড়ভাবে এসব পর্যবেক্ষণ করছিল। ১৯৭৫ সালের মার্চে 'অভ্যুত্থানের গুজব' নিয়ে মার্কিন দূতাবাস খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এসব বিষয়ে প্রকাশিত মার্কিন দলিলে অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকারের অগোচরে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আলোচনা করতে। ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই একইভাবে সংগ্রহের জন্য যায় ফারুকের ভায়রা মেজর আব্দুর রশিদ। ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির পক্ষে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ক্রয় নিয়ে কথা বলতে তাকে পাঠানো হয় বলে দাবি করেছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালের ১৩ মে সৈয়দ ফারুক রহমান উচ্চতর পর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা চান।

বাংলাদেশের একটি মার্কিনমুখিতার সূচনা ঘটেছিল একাত্তরের কোনো একসময় ভারতের মাটিতে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সঙ্গে

কনফেডারেশন গঠন প্রশ্নে নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসনের সঙ্গে 'পূর্ব যোগাযোগ' ঘটেছিল। হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৯ সালে তার 'হোয়াইট হাউজ ইয়ারস'-এ লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত এল কে ঝায়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল।' পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ একাত্তরের ওই 'পূর্ব যোগাযোগের' আলোকেই দৃঢ় ভিত্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। লিফশুলজ আবু তাহের হত্যা মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চে তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিব হত্যা মামলায় জিয়াউর রহমান জড়িত ছিলেন। প্রকাশিত মার্কিন দলিল, ফারুক-রশিদের কথোপকথন এবং অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের বই 'বাংলাদেশ: আ লিগ্যাসি অব ব্লাড' থেকে স্পষ্ট, 'জিয়া আগস্ট অভ্যুত্থানের মুখ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি চাইলে অভ্যুত্থান বন্ধ করতে পারতেন। কারণ, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি আগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন।'

মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার এরিক হিচেন্স ২০০১ সালে তাঁর 'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' বইয়ে কিসিঞ্জারকে একজন যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিসিঞ্জারের বিচারের জন্য নুরেনবার্গসহ অন্য কিছু ট্রাইব্যুনালের আদলে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের দাবিও তোলেন তিনি। কিসিঞ্জারকে তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এক বিচিত্র মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেন। হিচেন্স লিখেছেন, 'তার কারণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তার জন্য অসুবিধাজনক কতিপয় ব্যক্তির কথাও আমরা জানি। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাল্‌ভাদর আলেন্দে, আর্চ বিশপ ম্যাকারিওস ও শেখ মুজিবুর রহমান।' নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ১৯৮১ সালে লিখেছেন, '১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের কারণ আর যাই হোক, সেটা খাদ্য কমে যাওয়ার কারণে ঘটেনি। তবে ওই সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্য না দিতে মার্কিন প্রশাসনের রাজনীতিটাও অস্বীকার করা যাবে না।' 'অধ্যাপক রেহমান সোবহান লিখেছেন, '১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে এক প্রকট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে খাদ্য সাহায্যকে ব্যবহার করল। সেই চাপ ছিল এমন একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার জন্য, যার ফসল হলো ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তন।' এমা রথচাইল্ড ১৯৭৬ সালে লিখেছেন, 'কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক রদ না করা পর্যন্ত মার্কিন খাদ্যবাহী জাহাজ বাংলাদেশে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।'

১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় ঘোষণা করেন তৎকালীন ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল। রায় শেষে বিচারক কাজী গোলাম রসুল মন্তব্য করেছেন, 'প্রাসঙ্গিককভাবে ইহা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না যে, এই মামলায় প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বিশেষ করিয়া যাহারা ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারা তাহাদের দায়িত্ব পালন করেন নাই, এমনকি পালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্ত্বেও। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন আদেশ পাওয়ার পরও নিরাপত্তার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। সাক্ষ্যপ্রমাণে ইহা, পরিষ্কার যে, মাত্র দুটি রেজিমেন্টের খুবই অল্পসংখ্যক জুনিয়র সেনা অফিসার/সদস্য এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কেন এই কতিপয় সেনা সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ/নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে নাই, তাহা বোধগম্য নয়। ইহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সেনাবাহিনীর জন্য একটি চিরস্থায়ী কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।'

সেসময়ের ডিজিএফআই প্রধান ব্রিগেডিয়ার রউফ ঘটনার কিছুদিন আগে মেজর ডালিম এবং মেজর নূরসহ কিছু অফিসারের সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানিয়েছিলেন। এরপর ব্রিগেডিয়ার রউফের আর কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায়নি। ১৪ আগস্ট বিকাল থেকেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সব প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শেষ বৈঠক, নাইট প্যারেডের নামে সেনা সমাবেশ, অস্ত্রাগার খুলে দিয়ে অস্ত্র ও গুলি বিতরণ, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা, সেনাদের উদ্দেশে ব্রিফিং, ট্যাঙ্কসহ বিকট শব্দে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে দীর্ঘসময় যাতায়াত, সবকিছু প্রকাশ্যেই হয়েছে। যাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল, তারা কেন কিছুই জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি–এটি একটি বড়ো প্রশ্ন।

১৯৭৫ সালের মার্চে কুমিল্লা বার্ডের গোপন বৈঠক, জুনে মোশতাকের গ্রামে, জুন-জুলাইয়ে দাউদকান্দি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে, মোশতাকের বাড়ি–আগামসি লেনের বাসায় কতিপয় রাজনীতিক-আমলা-সেনা সদস্যদের এত প্রকাশ্য বৈঠক গোয়েন্দা নজরদারি কীভাবে এড়িয়ে গেল।

অবশ্যই প্রশ্ন আছে–কেন রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তায় নিয়োজিত সেনা সদস্যদের কাছ থেকে সব গুলি নিয়ে যায়? কেন সেনা সদর, পুলিশ কন্ট্রোল রুম, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস এবং গণভবনে বঙ্গবন্ধু টেলিফোন করার চেষ্টা করে কাউকে পেলেন না? যাদের পেলেন–একমাত্র কর্নেল জামিল ছাড়া অন্য কেউ ঘণ্টাখানেক সময় পেয়েও কেন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? এসবের জবাব নতুন প্রজন্মকে পেতে হবে। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান কেন চাকরিচ্যুত মেজর ডালিম-মেজর নূরকে ক্যান্টনমেন্টে অবাধে চলাফেরার অনুমতি দিল?

কেন একটি দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এবং রাষ্ট্রপতির সব নিরাপত্তা বাহিনী তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেল?

এসব প্রশ্নের জবাব একদিন দেশের মানুষের সামনে কাউকে না কাউকে উন্মোচন করতে হবে। নতুন প্রজন্ম গবেষণা আশ্রয়ী, সত্যাশ্রয়ী, ইতিহাস আশ্রয়ী–এসবের জবাব একদিন তারা খুঁজে বের করবেই।

২০২২ সালের শোকের মাসে জনতার দাবি:

১. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাজাপ্রাপ্ত খুনের আসামিদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে।

২. আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে: বাংলাদেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার মূলমন্ত্র রক্ষা, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চিরতরে বন্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে, যাতে কোনো পরিস্থিতিতেই এর কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত না হয়। এটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, জাতীয় বেইমানদের সঙ্গে অনেক আন্তর্জাতিক মহল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা উদ্যোগ নিয়ে লন্ডনভিত্তিক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য স্যার টমাস উইলিয়ামসের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন করেছিলেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি ১৯৫জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আপ্রাণ চেষ্টা করেও আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পাননি বলে সেই বিচার করা যায়নি।

ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলবে, এটাই নিয়ম; কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলো আলোকিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। অবশ্যই একদিন আলো ঝলমল করবে আগামী প্রজন্মের এই বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু হত্যা ॥ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর ও বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া

রাজন ভট্টাচার্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর বিশ্বব্যাপী ব্যাপক নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বিস্ময়ে হতবাক গোটা দুনিয়া। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিশ্বনেতাদের অনেকেই। কেউ কেউ একথা বিশ্বাস করেতেই পারছিলেন না–বঙ্গবন্ধুর মতো একজন আন্তর্জাতিকমানের নেতাকে তাঁর নিজ দেশের মানুষ হত্যা করতে পারে!

যিনি একটি স্বাধীন দেশ দিলেন, পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিলেন, লাল-সবুজের পতাকা জাতির হাতে তুলে দিলেন, বারবার জেল খাটলেন, একটি স্বাধীন দেশের জন্ম ও মানুষের প্রয়োজনে মৃত্যুর কাছাকাছি গেলেন বহুবার, বিশ্বমানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জায়গা করে নিলেন–তাঁকে হত্যা করা যায়? সবার মধ্যেই এমন প্রশ্নের উদ্রেগ হয়েছিল। তাই তো বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন বিশ্বের বিবেকবান সব নেতা থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়া বাংলাদেশের মিত্ররা।

যারা রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছিলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার পর অনেকেই তাঁকে অনন্য নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করতে ভুল করেননি। সেসময় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদ ফলাও করে প্রচার করা হয়। যারা বঙ্গবন্ধুর নাম শুনেছেন, কিন্তু কোনোদিন দেখা হয়নি; তারাও তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসায় ছিলেন উচ্ছ্বসিত। এমন একজন নেতার মৃত্যুর খবরে মনের অজান্তেই কেঁদেছেন কেউ কেউ।

একাত্তরের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফসল বাংলাদেশ তখন সদ্যোজাত শিশুর মতো মাথা তুলে দাঁড়ানোর সংগ্রামে রত। কিন্তু এর আগেই ষড়যন্ত্র আর ক্ষমতার লোভ স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় দেশকে নিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে।

এ ঘটনা যখন ঘটে, এর আগেই বঙ্গবন্ধু শোষিত, বঞ্চিত আর অধিকারহারা মানুষের নেতা হিসাবে পরিণত হয়েছিলেন বিশ্বব্যক্তিত্বে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় নেতৃত্ব

তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল বিশ্বনেতাদের মধ্যে অনন্য উচ্চতায়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রনেতাদের চোখে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ফলে তাঁর হত্যাকাণ্ডের খবর বিশ্ববিবেককে নাড়া দেওয়ার ঘটনা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের আগের ও পরের রাজনৈতিক ঘটনা ও ইতিহাসের চিত্র তখন বিশ্বগণমাধ্যমে যেভাবে উঠে আসছিল, এর ওপর বেশকিছু ক্ষেত্রে তৎকালীন মার্কিন-সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবও ছিল।

বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতার সময় থেকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বলে পরিচিত ভারতে। সেদিন ছিল দেশটির স্বাধীনতা দিবস। ভারতের বিভিন্ন পত্রিকা ও রেডিয়োতে গুরুত্বসহকারে এই খবর প্রচার হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখা গণমাধ্যম হিসাবে পরিচিত ভারতীয় বেতার 'আকাশবাণী' ১৬ আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বলে, 'যিশু মারা গেছেন। এখন লাখ লাখ লোক ক্রুশ ধারণ করে তাঁকে স্মরণ করছেন। মূলত একদিন মুজিবই হবেন যিশুর মতো।'

একই দিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ বলা হয়, 'বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করবে।'

ঘটনার পরদিন, ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট 'ওয়াশিংটন পোস্ট' তার নয়াদিল্লি প্রতিনিধির লেখা প্রতিবেদন ছাপাল। সেখানে লেখা ছিল, 'একটি সেনাসমর্থিত সরকার মধ্যরাতে পরিচালিত এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করেছে। মনে করা হচ্ছে, সরকারটি ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষের। ক্ষমতাচ্যুতির ওই বিদ্রোহ দারিদ্র্যপীড়িত দেশটির স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।'

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের হিসাবমতো খবরটি প্রচার করে। এর মূল কারণ হলো, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে নেপথ্যে ছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। যেসব দেশ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান নিয়েছিল বা হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিল, তারা বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর প্রাণ খুলে প্রচার করতে পারেনি। বরং সেনা সমর্থিত খন্দকার মোশতাকের নতুন সরকারের বিষয়টি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার খবরে সেদিন খানিকটা যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল একাত্তরের পরাজিত শক্তি পাকিস্তান। ১৫ আগস্ট সকালেই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর করাচি ও লাহোরের পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ বুলেটিন বের করে। রেডিয়ো পাকিস্তানের সকাল ৮টার খবরেও গুরুত্বসহকারে তা প্রচার করা হয়।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ৫০ হাজার টন চাল এবং ১০ মিলিয়ন গজ সুতা উপহার দেয়। পাশাপাশি ওআইসি এবং অন্য মুসলিম দেশগুলোকে পাকিস্তান আহ্বান জানায় যেন তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

মার্কিন পত্রিকা 'ওয়াশিংটন পোস্ট' বঙ্গবন্ধু হত্যা ও বিদ্রোহ নিয়ে বিস্তারিত লিখলেও তৎকালীন সোভিয়েত পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া' ভেতরের পাতায় এ ঘটনার একটা ছোটোখাটো খবর ছেপেছিল। সেখানে কারও উক্তিও ছিল না।

তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' অবশ্য লিখেছিল, বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার 'প্রতিকূল শক্তিগুলো' হয়তো দেশটির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।'

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ডের ঠিক এক সপ্তাহ পর 'নিউইয়র্ক টাইমস' মস্কো থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে লিখেছিল, 'গত সপ্তাহে বাংলাদেশে হওয়া সেনাবিদ্রোহের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় ক্রেমলিন আজ (২২ আগস্ট) ইঙ্গিত দিয়েছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের উৎখাত হয়তো দেশটিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দূরে সরিয়ে চীনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মার্কিন সংবাদ চ্যানেল 'এবিসি নিউজ' গুরুত্বসহকারে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরটি প্রচার করে। 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থান' শিরোনামের ওই খবরে বলা হয়, 'বাংলাদেশে সংগঠিত ক্যুতে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাড়িতে নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও প্রাণ হারিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং তিনি দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে পালটে ইসলামি প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রেখেছেন।'

মার্কিন আরেক চ্যানেল 'এনবিসি' নিউজের খবরে বলা হয়, 'বাংলাদেশের জাতির পিতা ও স্বাধীনতা লাভের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক মিলিটারি ক্যুতে তাঁর দেহরক্ষীদের দ্বারা নিহত হয়েছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে মুজিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কট্টর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেশের নাম পালটে ইসলামি প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রেখেছেন।'

কানাডার 'সিবিএস নিউজ'-এর খবরে বলা হয়, 'এক আকস্মিক ক্যুতে বাংলাদেশে সেনা সমর্থিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন।'

১৫ আগস্ট ওই ঘটনার পর 'বিবিসি'র খবরে বলা হয়, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হলেন তাঁর নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে। অথচ তাঁকে হত্যা করতে পাকিস্তানিরা পর্যন্ত সংকোচবোধ করেছে।'

১৮ আগস্ট পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক 'জং'-এর সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো হয়। সেখানে মোশতাক সরকারকে বঙ্গবন্ধুর আমলে সম্পর্কের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে দ্রুত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেরও পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ ও মার্টিন উলাকট ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের বর্ণনা ছিল সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনার একটি। ওইদিন কী হয়েছিল এবং এর পেছনে কী কী কাজ করেছে, এর অনেক কিছুই বেরিয়ে এসেছিল তাঁদের লেখনীতে। ওই প্রতিবেদন ব্রিটিশ পত্রিকা 'গার্ডিয়ান' ১৯৭৫ সালের ২৮ আগস্ট তাদের লিড নিউজ হিসাবে প্রকাশ করেছিল।

১৫ আগস্টের চার বছর পর ১৯৭৯-এর ১৫ আগস্ট লিফশুলজ শেখ মুজিবুর রহমানের উৎখাতের সেই সেনা অভ্যুত্থানের পেছনের চক্রান্ত নিয়ে আরেকটি লেখা লিখেন। সেটাও গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতিবেদনটিতে লিফশুলজ লিখেছিলেন, 'ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে কর্মরত মার্কিন কর্মকর্তা এবং বিস্তারিত জানা বাঙালি কিছু সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে বলা যায়, 'যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু হত্যার জন্য ঘটানো সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে জানত। এমনকি

> শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং জনসাধারণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর বুলেট-বিক্ষত বাসগৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্ন এবং তার কবরস্থান পুণ্য তীর্থে পরিণত হবে

আমেরিকান দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের ছয় মাসেরও বেশি সময় আগে বিদ্রোহ পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িতদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় বসেছে।'

বিভিন্ন প্রতিবেদনে কোনো বিদেশি বা বাঙালি সাংবাদিকই ভাসাভাসা কথাগুলোর গভীরে গিয়ে কিছু জানার চেষ্টা করেননি।

'সেনা কর্মকর্তারা একাই ঘটনাটা ঘটিয়েছিলেন কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়াই, এই ব্যাখ্যার সংস্করণটি একটি মিথ, যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল', লিখেছিলেন লিভশুলজ।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানে লেখা হয়েছিল, 'মুজিব ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব'। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় বলা হয়, 'মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনই জন্ম নিত না।'

বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর পাওয়ার পর পশ্চিম জার্মানি পত্রিকায় বলা হয়েছিল, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জনগণ তাঁর কাছে এত জনপ্রিয় ছিল যে লুইয়ের মতো তিনি এ দাবি করতে পারেন যে, আমিই রাষ্ট্র।'

নিউজ উইকে বঙ্গবন্ধুকে 'পয়েট অব পলিটিক্স' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী টাইম ম্যাগাজিন ১৯৮২ সালের ৫ এপ্রিল তাদের একটি সংখ্যায় উল্লেখ করে, 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দশ বছরের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের আমল ছিল সর্বপ্রথম এবং দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আমল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাসংগ্রামের নায়ক ও প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে হত্যার পর হঠাৎ গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে।'

'দ্য টাইমস অব লন্ডন'-এর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়, 'সবকিছু সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সব সময় স্মরণ করা হবে। কারণ, তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই।'

বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া

দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্পসময়ের ব্যবধানে জাতির পিতাকে হত্যা করা হবে, তা কখনই বিশ্বাস করতে পারেননি বিশ্বনেতারা। এ খবরে স্তম্ভিত হয়ে যান বিভিন্ন দেশের নেতারা। বিশ্ববাসীর সহযোগিতা নিয়ে যখন তিনি দেশকে নতুন করে গোছানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে হত্যা করা হবে–এটা সত্যিই সবার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো–যাঁর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম, তাঁকে কীভাবে হত্যা করা হয়? এমন প্রশ্ন ছুড়েছিলেন অনেকেই। কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করায় বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ঘৃণাও জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'তোমরা আমারই দেওয়া ট্যাঙ্ক দিয়ে আমার বন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছ! আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি।'

খবর শোনার পর ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহিদ। তাই তিনি অমর।'

বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।'

নোবেলবিজয়ী উইলিবান্ট বলেছিলেন, 'মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না, যারা মুজিবকে হত্যা করেছে, তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।'

'শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক' ছিল বলে মন্তব্য করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

বঙ্গবন্ধুকে আরও বড়ো করে মূল্যায়ন করেছেন ব্রিটিশ এমপি জেমসলামন্ড। তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি, বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে।'

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ঢাকায় সংবাদ কাভার করতে এসে বিমানবন্দর থেকে জোর করে ফেরত পাঠানো সাংবাদিক ব্রায়ান ব্যারন লন্ডনে ফিরে লিখেছিলেন, 'শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং জনসাধারণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর বুলেট-বিক্ষত বাসগৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্ন এবং তাঁর কবরস্থান পুণ্য তীর্থে পরিণত হবে। (দ্য লিসনার, লন্ডন, ২৮ আগস্ট ১৯৭৫)।'

ব্রিটিশ লর্ড ফেন্যার ব্রোকওয়ে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব জর্জ ওয়াশিংটন, গান্ধী এবং দ্য ভ্যালেরার থেকেও মহান নেতা ছিলেন।'

জাপানি নাগরিক মুক্তি ফুকিউরা বাঙালি দেখলে বলতেন, 'তুমি বাংলার লোক? আমি কিন্তু তোমাদের জয় বাংলা দেখেছি। শেখ মুজিব দেখেছি। জানো এশিয়ায় তোমাদের শেখ মুজিবের মতো সিংহ হৃদয়বান নেতার জন্ম হবে না বহুকাল।'

ফিলিস্তিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইয়াসির আরাফাত বলেছিলেন, 'আপসহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।'

জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথা কাউন্ডা বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনামি জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব দৈহিকভাবেই মহাকায় ছিলেন, সাধারণ বাঙালির থেকে অনেক উঁচুতে ছিল তাঁর মাথাটি, সহজেই চোখে পড়ত তাঁর উচ্চতা। একাত্তরে বাংলাদেশকে তিনিই আলোড়িত-বিস্ফোরিত করে চলেছিলেন, আর তাঁর পাশে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছিল তাঁর সমকালীন এবং সাবেক সব বঙ্গীয় রাজনীতিবিদ। জনগণকে ভুল পথেও নিয়ে যাওয়া যায়; হিটলার মুসোলিনির মতো একনায়করাও জনগণকে দাবানলে, প্লাবনে, অগ্নিগিরিতে পরিণত করেছিল, যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। তারা জনগণকে উন্মাদ আর মগজহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিল। একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিলেন শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ আগ্নেয়গিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে, যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম।'

মরহুম মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবের কবর একদিন সমাধিস্থলে রূপান্তরিত হবে এবং বাঙালির তীর্থস্থানের মতো রূপলাভ করবে।'

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর শোকে পাথর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশে আসার জন্য জার্মানির একটি এয়ারপোর্টে তাঁর পাসপোর্টটি ইমিগ্রেশন অফিসারকে দেখালে সেই অফিসার পাসপোর্টটি দেখেই শেখ হাসিনাকে বললেন 'ছি, তোমরা বাংলাদেশিরা খুব জঘন্য একটি জাতি, যেই মানুষটি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, তাঁকেই তোমরা হত্যা করে ফেললে?'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মতো তেজি এবং গতিশীল নেতা আগামী বিশ বছরের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের আত্মঘাতী চরিত্রই তুলে ধরেছে।'

জাপানি নাগরিক মুক্তি ফুকিউরা বাঙালি দেখলে বলতেন, 'তুমি বাংলার লোক? আমি কিন্তু তোমাদের জয় বাংলা দেখেছি। শেখ মুজিব দেখেছি। জানো এশিয়ায় তোমাদের শেখ মুজিবের মতো সিংহ হৃদয়বান নেতার জন্ম হবে না বহুকাল।'

বিখ্যাত উর্দু কবি নওশাদ নুরি তার টুঙ্গিপাড়া নামক কবিতায় বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে এভাবেই বলেছেন, 'পথের শুরুটা হয়েছিল এইখানে/পথ খোয়া গেল, হায় সেও এইখানে।'

অসীম সাহসিকতার জন্য ব্রিটিশ রাজকবি টেড হিউজ বঙ্গবন্ধুকে 'টাইগার অব বেঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত লেখক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ 'আঁন্দ্রে মার্লো' বঙ্গবন্ধুকে বাঘের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমেরিকার প্রথাবিরোধী কবি অ্যালেন গিনসবার্গ বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতির একজন প্রকৃত নেতা মনে করতেন।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে পরিচিত প্রণব মুখার্জি বঙ্গবন্ধুকে সাহসী নেতা আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'আই স্যালুট দ্য ব্রেভ লিডার অব অল টাইমস।' একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মদাতাকে এভাবে হত্যা করায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলাম লেখক

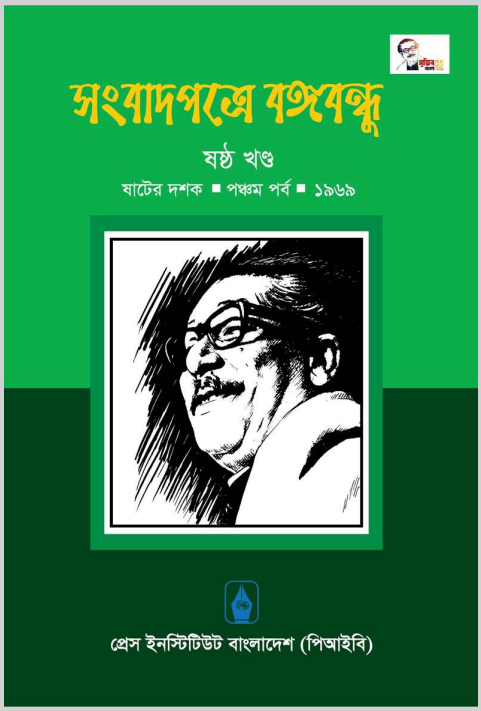

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তিনি এভাবেই এলেন এভাবেই চলে গেলেন

নিরঞ্জন রায়

পনেরোই আগস্ট এলেই আমার একটি বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা 'দ্য প্যাট্রিয়ট'-এর বিষয়বস্তু খুব বেশি মনে পড়ে। 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতাটি আমাদের উচ্চমাধ্যমিকে পাঠ্য ছিল এবং আমাদের সমসাময়িক সবাই এই কবিতা পাঠ্যসূচির অংশ হিসাবে পাঠ করেছে। কবিতাটির একটি বিখ্যাত লাইন 'দাজ আই এনটারড, দাজ আই গো' আমাদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়ের একটি ব্যাখ্যা হিসাবে আসত। কারণ, এ লাইনটি কবিতার মূল বিষয়বস্তু। আর এ কারণে আমরাও খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়তাম। পড়তাম মানে, না-বুঝেই মুখস্থ করতাম আর কী। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যখন অনেক কষ্ট করে কিছুটা ইংরেজি ভাষা রপ্ত করলাম, তখন কবিতাটা আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে এর বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করি এবং সেই থেকে প্রতিবছর ১৫ আগস্টের শোক দিবসে 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতাটি বারবার পাঠ করি।

কবিতাটির বিষয়বস্তু এমন যে, একজন দেশপ্রেমিক নেতা তাঁর দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন, যার সুফল জনগণ সরাসরি ভোগ করে যারপরনাই উপকৃত হয়েছে। দেশপ্রেমিক নেতা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বিকার করেছেন শুধু তাঁর দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য এবং এজন্য সর্বস্তরের জনগণও সেই দেশপ্রেমিক নেতাকে মাত্রাতিরিক্ত ভালো বেসেছেন এবং শ্রদ্ধা করেছেন। দেশের মানুষের এই অভূতপূর্ব ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেই দেশপ্রেমিক নেতার ফিরে আসার দিন। সেই নেতা যেদিন দেশে ফিরছিলেন, তখন জনগণ রাস্তায় নেমে এসেছিল। সংবর্ধনার মাঠ এবং যে রাস্তা দিয়ে নেতা যাবেন, সেখানে শুধু মানুষ আর মানুষ। তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। রাস্তায় দাঁড়ানোর স্থান না পেয়ে অনেকে আশপাশের বাসাবাড়ির ছাদে এবং গাছের ডালে উঠেছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বাড়ির ছাদ এবং গাছের ডাল যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে; কিন্তু তাতে জনগণের ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, তা হচ্ছে–তাদের প্রিয় নেতাকে একপলক দেখবে এবং

তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবে। জনগণের এমন অভূতপূর্ব ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে সেই দেশপ্রেমিক নেতা এতটাই অভিভূত হন যে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে এমন কী আর করেছেন, যেজন্য জনগণ তাঁকে পাগলের মতো শ্রদ্ধা করছে। জনগণ সেই নেতাকে এতটাই অন্ধের মতো ভালোবাসে যে, নেতা যা বলবেন তারা তাৎক্ষণিক তাই করবে। দেশপ্রেমিক নেতা আকাশের চাঁদ হাতে চাইলে সেই জনগণ দেশপ্রেমিক নেতাকে বলেন যে এত সামান্য জিনিস কেন তিনি চাইছেন, এর চেয়ে আরও মূল্যবান কিছু চাইছেন না কেন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রিয় নেতাকে জানিয়ে দেয় যে নেতার যে কোনো আদেশ পালনে তারা সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

কিন্তু সেই দেশপ্রেমিক নেতা এক বছরের মধ্যেই উলটো পরিস্থিতি দেখতে পান। তিনি স্পষ্টতই দেখতে পান যে তাঁর বিরুদ্ধে একশ্রেণির লোক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তাঁর ভালো কাজগুলো মুছে ফেলে তাঁকে নানারকম অপবাদ দিতে শুরু করে। একপর্যায়ে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে সেই প্রিয় নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এক বছর আগে যে রাস্তা দিয়ে তাঁকে লাখ লাখ জনতা স্বাগত জানিয়েছিল, ঠিক সেই রাস্তা দিয়েই এক বছর পর দেশপ্রেমিক নেতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য। দেশপ্রেমিক নেতা লক্ষ করেছেন, এক বছর আগে যে রাস্তা হয়েছিল জনসমুদ্র, সেই রাস্তা এখন জনশূন্য। কিছু চক্রান্তকারী দুষ্টলোক দেশপ্রেমিক নেতাকে অপমান করছে, কেউ কেউ পাথরও ছুড়ে মারছে। ষড়যন্ত্রকারীরা এখন এতটাই ক্ষমতাধর যে, তাদের ভয়ে অধিকাংশ মানুষ আজ রাস্তায় নেই। তাদের অনেকে লুকিয়ে লুকিয়ে অসহায়ের মতো দেশপ্রেমিক নেতার এই করুণ পরিণতি দেখছেন মাত্র। এই অবস্থা দেখে সেই দেশপ্রেমিক নেতা নিজের মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন এই ভেবে যে তিনি বিবেকের কাছে খুব পরিষ্কার। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করে কাজ করেছেন। তাই তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীকে মোটেও ভয় করেন না। কারণ, ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পরপারে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জন্য সত্যিকার পুরস্কার নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

কবি রবার্ট ব্রাউনিং তার 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতায় একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক নেতার জীবনকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনই তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু চরম ত্যাগ স্বীকার করে নিজের কথা একেবারেই না ভেবে শুধু বাঙালি জাতির মুক্তির কথা ভেবে এই জাতির জন্য এনে দিলেন নিজস্ব আবাসভূমি। একটি জাতির জন্য এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার। সমগ্র বিশ্বে বাঙালি জাতির একমাত্র নিজস্ব আবাসভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ, যা এনে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। এর থেকে ভালো কোনো কাজ রবার্ট ব্রাউনিং রচিত কবিতার সেই প্যাট্রিয়ট করেছিলেন কি না, এর উল্লেখ অবশ্য সেই কবিতায় নেই। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে পুরো বাঙালি জাতিকে একাত্ম করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই দেশের মানুষ স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এই অবস্থাকে রবার্ট ব্রাউনিং বর্ণনা করেছেন নেতার জন্য আকাশের চাঁদ নিয়ে আসাও এক সামান্য কাজ হিসাবে। দেশপ্রেমিক নেতার ফিরে আসার দিনে জনগণের উপচে পড়া ভিড়ের যে বর্ণনা রবার্ট ব্রাউনিং দিয়েছেন, সেই অবস্থা তো ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় সৃষ্টি হয়েছিল, যেদিন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। লাখ লাখ জনতা সেদিন বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত সমবেত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য এবং তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর জন্য। সেদিনও রাস্তার আশপাশের বাড়ির ছাদ এবং গাছের ডালে মানুষের অবস্থান ছিল চোখে পড়ার মতো। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল ঢাকা শহরে, তারই হুবহু বর্ণনা আছে রবার্ট ব্রাউনিং রচিত 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতায়।

কবিতাটির সেই দেশপ্রেমিক নেতার প্রত্যাবর্তনের এক বছরের মধ্যেই কিছু দুষ্টলোক ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়, যার বর্ণনা কবি রবার্ট ব্রাউনিং দিয়েছেন কবিতার দ্বিতীয় প্যারায়। ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর জীবনে। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পরপরই শুরু হয়ে যায় ষড়যন্ত্র, যার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে তিন বছরের মাথায়। কবিতাটির ষড়যন্ত্রকারীদের মতো আমাদের দেশেও কিছু কুলাঙ্গার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর মানুষকে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা এবং বিশ্বাস করার সুযোগ চতুরতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে আপাতদৃষ্টিতে সফল হয় এবং বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার মাত্র তিন বছরের মধ্যে তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরকম নির্মম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কি না, আমাদের জানা নেই। 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতার প্যাট্রিয়টকে যেদিন হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কোনো মানুষই রাস্তায় বের হয়নি অথচ এক বছর আগে সেই স্থানেই লোকে লোকারণ্য ছিল এই দেশপ্রেমিক নেতাকে স্বাগত জানানোর জন্য। সেই 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতায় কবি রবার্ট ব্রাউনিং যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেভাবেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট একদল ঘাতক বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করল; কিন্তু জনগণ সেভাবে রাস্তায় নেমে এলো না। অথচ মাত্র তিন বছর আগে বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীন দেশে ফিরছিলেন, তখন এই ঢাকা শহরের রাস্তায় মানুষের তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায়ই হতভম্ব হয়েই হোক, আর স্বাধীন দেশে হঠাৎ করে সেনাবাহিনী নেমে পড়ার কারণে ভয় পেয়েই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করতে না পারাটা জাতি হিসাবে আমাদের জন্য লজ্জার এবং কলঙ্কের, যা আমাদের চিরদিন বয়ে বেড়াতে হবে।

'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতার দেশপ্রেমিক নেতা যখন কাউকে তার পাশে পেলেন না, তখন তিনি নিজেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সত্যিকার পুরস্কার পাওয়ার আশায় নিজের জন্য সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। বঙ্গবন্ধুও অন্তিমকালে কাউকেই পাশে পাননি। পুলিশ, সেনাবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, নেতাকর্মী এবং জনগণ–কাউকেই যখন পাশে পেলেন না, তখন তিনিও হয়তো ভেবেছেন–'আমি সারা জীবন কষ্ট করে তোমাদের মুক্তির জন্য কাজ করেছি, তোমাদের উন্নতির জন্য কাজ করেছি, এনে দিয়েছি তোমাদের নিজস্ব আবাসভূমি। আজ তোমরাই আমাকে হত্যা করতে এসেছ। হত্যা কর, কোনো অসুবিধা নেই, কেননা বেহেশতে আমার এই ভালো কাজের পুরস্কার অপেক্ষা করছে।' বঙ্গবন্ধুর মনের এই অভিব্যক্তিই রবার্ট ব্রাউনিং রচিত 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতার শেষ প্যারায় বর্ণিত হয়েছে। সত্যি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, তুমি নিশ্চয়ই বেহেশতে শান্তিতেই আছ, শান্তিতেই থাক। আজ তোমার আশীর্বাদ নিয়ে তোমারই সুযোগ্যকন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে তোমার সোনার বাংলা এগিয়েছে অনেক দূর। তোমাকে যেসব ষড়যন্ত্রকারী হত্যা করেছিল, তারা নিজেরাই আজ আস্তাকুঁড়ে। হত্যাকারীদের বিচারও হয়েছে। যাদের সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি, তারা আরও বেশি কষ্টে আছে। কারণ, তারা লোকসম্মুখে আসতে পারে না। তোমার হত্যার দিনে যারা রাস্তায় নামতে পারেনি, তারা আজ রাস্তায় আছে তোমার নামে।

জাতীয় শোক দিবসের দিনে এই কবিতাটা বেশ কয়েকবার পাঠ করি আর ভাবি, ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং কোন রাজনৈতিক নেতার

এ রকম করুণ অবস্থা দেখে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও আলোচিত হত্যাকাণ্ড তো কম হয়নি। দার্শনিক সক্রেটিস, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন এবং আততায়ীর হাতে নিহতও হয়েছেন। কিন্তু তাদের সবারই জনপ্রিয় হয়ে ওঠা, জনগণের কল্যাণে অবদান রাখা, জনগণের অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনের যে ইতিহাস, এসবের কোনোটির সঙ্গে এই কবিতার হুবহু বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর জীবনের ঘটনার সঙ্গেই হুবহু মিল খুঁজে পাই 'দ্য প্যাট্রিয়ট' কবিতায়। কবি রবার্ট ব্রাউনিং যদি কবিতাটি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পরে রচনা করতেন, তাহলে তো নিশ্চিত করেই বলা যেত যে, কবি বঙ্গবন্ধুকে নিয়েই এই কবিতাটি রচনা করেছেন। তাহলে কবি রবার্ট ব্রাউনিং কি জানতেন যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে বঙ্গবন্ধু এই পৃথিবীতে আসবেন, চরম ত্যাগ স্বীকার করে শোষিত ও বঞ্চিত বাঙালি জাতিকে মুক্ত করে তাদের এনে দেবেন নিজস্ব আবাসভূমি এবং সেই দেশেরই কিছু ষড়যন্ত্রকারীর দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হবেন। আর সে কারণেই কি তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্যই কবিতাটি সেই উনিশ শতকে রচনা করে গেছেন, যেখানে তিনি যথার্থই বলেছেন: 'দাজ আই এনটারড, দাজ আই গো'। অর্থাৎ, কবির ভাষায়–'বঙ্গবন্ধু এভাবেই এলেন এবং এভাবেই চলে গেলেন'।

লেখক: CPA, CMA, CAMS, সার্টিফাইড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরেন্টো, কানাডা

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

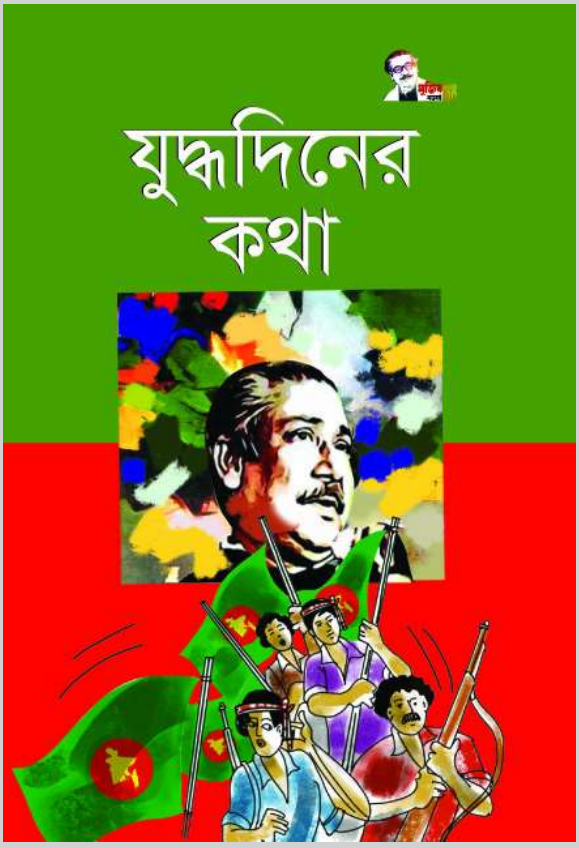

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাঙালির তীর্থ

পপি দেবী থাপা

স্মরণকালের নৃশংসতম বর্বরতা আর স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের বিশ্বাসঘাতকতার কালো অধ্যায়ের সাক্ষী, রক্ত, অশ্রুসিক্ত বাড়িটি আজও বাংলাদেশ আর বাঙালির ভালোবাসা বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে। এ বাড়িটিই বলে দেয় দেশ-জাতিকে ভালোবাসায় নিজেকে বলিদান দিতে হয় কীভাবে। এটি নয় শুধু ইট, বালু, কংক্রিটে মোড়া ছাদ আবৃত কোনো সাধারণ আবাসস্থল। এটি স্বাধীন বাংলার গর্ভাশয়। বাঙালি জাতিসত্তার প্রাণকেন্দ্র। যেখানে প্রায় ১৪ বছর সপরিবারে কাটিয়েছেন বাংলার মুক্তিদাতা, স্বাধীনতাসংগ্রামের মহানায়ক, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে বাড়ির প্রতিটি পরতে রয়েছে বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া। এর পুরো বাতাবরণে ছড়িয়ে আছে বাংলার মুক্তিসনদ প্রণয়ন আর বিজয়গাথার স্তরগুলোর সুচিন্তিত, সঠিক দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্তের জয়ধ্বনি। এ বাড়ি থেকেই ১৯৬২ সালে আইয়ুববিরোধী শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সফল নির্বাচন, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখানেই ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সর্বস্তরের বাঙালির ভালোবাসা, প্রেরণা, ভরসার অবাধ আশ্রয়স্থল ছিল ৩২ নম্বর সড়কের এই বাড়িটি। যেখানে স্বাধীন-সার্বভৌম সোনার বাংলার স্বপ্ন ডানা মেলেছিল। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত হয়েছিল স্বাধীন এক দেশ–বাংলাদেশ। স্বপ্ন তখন পরিণত বাস্তব। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ফেলে যাওয়া বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন এবং সোনার বাংলা গড়ার লড়াই শুরু। ঠিক তখনই ষড়যন্ত্রকারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর ঘাতকদের কালো ছায়া বাড়িটির চারপাশ অন্ধকার করে ঘিরে ধরছিল। ১৯৭৫। ১৫ আগস্ট। ঘাতকরা ইতিহাসের পাতায় লেপে দিল কলঙ্কের কালিমা। বুলেটের আঘাতে বঙ্গবন্ধুর বুকের মতোই ঝাঁজরা হলো বাড়িটিরও বুক।

বাড়িটির বারান্দা, করিডোর এখনো ফিরে পেতে চায় জাতির পিতার চরণের ছোঁয়া। নিচতলার বৈঠকখানায় উন্মুক্ত দরজায় তাকিয়ে চেয়ারগুলো কি আজও অপেক্ষা করছে জাতির পিতার আগমনের, শুনতে চাইছে কি সেই বজ্রকণ্ঠে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার নতুন কোনো নির্দেশনা। সর্বস্তরের বাঙালির উন্মুক্ত প্রবেশের বৈঠকখানার চেয়ারগুলো হয়তো বুঝতে পেরেছিল কারা এর ওপর বসে বাংলা আর বাঙালির ভালোবাসায় আত্মভোলা বঙ্গবন্ধুকে মুখে মধু, অন্তরে বিষ নিয়ে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রুমের বাতাবরণ কি অন্য নেতৃবৃন্দের সতর্ক করার মতো কোনো আভাস দিতে চেয়েছিল, যা দেশপ্রেম আর ভালোবাসায় অন্ধ, দেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর বঙ্গবন্ধু পাত্তা দেননি। ওরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তাঁর সব স্মৃতিচিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। ওরা জানে না, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবে ততদিন, যতদিন থাকবে বাংলাদেশ।

গ্রন্থাগারের চেয়ার, টেবিল, সেলফে রাখা পছন্দের বইগুলো আজও তোমার হাতের ছোঁয়া পেতে চায়। এখান থেকেই ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তুমি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলে। সবকিছুর সঙ্গে কী মধুর সম্পর্কটাই না ছিল তোমার! তোমার সঙ্গে তোমার বইগুলোর বুকও বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো, যা আজও বুকে বুলেট নিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে জানিয়ে চলেছে বাঙালির সত্যিকারের ইতিহাস। ওরা জানত না তুমি চিরঞ্জীব, আর যা কিছু তোমার স্পর্শ পেয়েছে, তা অনশ্বর।

বাড়ির মূল সিঁড়িটি বেয়ে কতবার তোমার আনাগোনা। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ ধারণ করে আছে তোমার চরণের ছোঁয়া। সেই রাতে যখন শেষবারের মতো চরণ দুখানি রেখেছিলে ওর বুকে, ও কি অনুভব করেছিল এখনই শেষ হয়ে যাবে সবকিছু! সিঁড়িটির পরেই চিরদিনের মতো শুয়ে পড়তে হবে তোমাকে। এখানেই গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশকে পড়ে থাকতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে চিৎকার দিয়ে বঙ্গমাতা বলেছিল, 'আমি যাব না, আমাকে এখানেই মেরে ফেল।' ওরা সেদিন বাঙালির বুক থেকে প্রাণ কেড়ে নিল। এখানেই রক্তে রঞ্জিত হলো বাংলার মানচিত্র। সিঁড়ি বেয়ে সে রক্ত ভেসে গেল বঙ্গোপসাগরে। ওরা জানত না–মুজিব কখনো মরে না, মুজিব বাঁচে কোটি প্রাণে। সেই সিঁড়ি আজও বুকে বঙ্গবন্ধুর রক্ত নিয়ে বিশ্ববাসীকে জানাতে চাইছে বাঙালির কলঙ্ক আর পিতা হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া সেই দিনের কথা।

দোতলার ডাইনিং টেবিল, বসার চেয়ার, সবার সঙ্গে বসে হাসি-আনন্দে বঙ্গমাতার রান্না করা, নিজ হাতে বেড়ে দেওয়া পুঁইডাঁটা, চিংড়ির চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট কিংবা ছোটো মাছের চচ্চড়ি! খাওয়ার ফাঁকে রাসেলের সঙ্গে তোমার খুনশুটি। সেদিন রাতের খাবারের সময় টেবিল, চেয়ার, প্লেট, গ্লাসে তোমার ছোঁয়া–ওরা কি বুঝতে পেরেছিল এরপর এই টেবিল, চেয়ার আর বাসনপত্রে কেউ হাত দেবে না। মুখ খুলে কেউ আর বয়াম থেকে আচার তুলবে না। থালাবাসন, চেয়ার টানার কোনো শব্দই আর ধ্বনিত হবে না এ বাড়িতে। ওরা পেয়েছে তোমার স্পর্শ, তুমি নেই, ওরা আর কারও ছোঁয়া পেতে চায় না। তাই আজও সেই জগ, গ্লাস, প্লেট, চায়ের কাপ, চামচ, ছুরি তোমার নিখাদ ভালোবাসার স্মৃতি আঁকড়ে বিশ্বজনতাকে বলতে চায় ভালোবেসে নির্মম প্রতিদান পাওয়ার কঠিন সত্যকে! খুনিরা জানত না বঙ্গবন্ধুকে কখনো হত্যা করা যায় না। বঙ্গবন্ধু বাঁচে বাংলার ধূলি-মাটি-কণায়, পাখির কুহুতানে।

দোতলার বৈঠকখানায় পরিবারের সদস্য এবং পারিবারিক অতিথিদের সঙ্গে বসে তোমার কথোপকথন, আলাপচারিতা, হাস্যালাপ। সেদিনের পর থেকে ঘাতকরা তা চির-অন্ধকারে মিলিয়ে দিল। তোমার বসার সেই চেয়ার, রুমের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় সিটিজেন ব্র্যান্ডের সাদাকালো টেলিভিশন আজও তোমার দৃষ্টির অপেক্ষায়। ওরা তোমার সব স্মৃতি আর ধ্বনির আভাস বুকে নিয়ে জাতিকে বলছে, দেশপ্রেমে পূর্ণ এক বিশাল হৃদয়ের কথকতা। খুনিরা জানত না মুজিবকথা কখনো অন্ধকারে আবর্ত হয় না। সে ধ্বনি বাজে বাংলার প্রতিটি প্রাণে। তা প্রতিনিয়ত জাগ্রত হয় বাংলার বুকে প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের মতো।

তোমার শয়নকক্ষের জানালার পর্দা, বিছানার চাদর কোন তাঁতে জন্ম নিয়ে ওরা হয়েছিল সার্থক–যে বাঙালি জাতির পিতার স্পর্শ পেয়েছিল! সেই চাদরে এলিয়ে সোনার বাংলার কত না স্বপ্ন দেখেছিলে তুমি পিতা! আর স্বপ্ন দেখার ঘরটাতেই কি নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকু, মেজো ছেলে শেখ জামাল, তাঁর স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, সাড়ে ১০ বছরের তোমার নিষ্পাপ রাসেল এবং আমাদের বঙ্গমাতাকে। যিনি তোমার পাশে থেকে সারাটি জীবন বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্গঠনে কাজ করে গেছেন নীরবে-নিঃস্বার্থে। বঙ্গমাতার নিথর দেহটি পড়ে থাকা এ ঘরের দরজাটি শেষবারের মতো শুনেছিল বঙ্গমাতার শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ, অনুভব করেছিল শেষ হৃৎস্পন্দন। কী আকুতি ছিল তাতে!

আজও এ কক্ষের পূর্বপাশের দেওয়াল, বুকে জমাট রক্তের ক্ষত নিয়ে সেই ভয়াল কালরাত্রির ইতিহাসকে লালন করছে সযত্নে। জিজ্ঞাসে, কী অপরাধ ছিল আমাদের? বাংলা আর বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসা? মেঝেতে ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য গুলির চিহ্নগুলো শোনাচ্ছে দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া গুলিবিদ্ধ শরীরের লুটিয়ে পড়ার করুণ চিৎকার। ওই যে ছাদের ওপরে ঘাতকদের গুলির আঘাতে জামাল বা রাসেলের উৎক্ষিপ্ত শুকিয়ে যাওয়া মগজের সঙ্গে মাথার কয়েকটা চুল, ওরা বাঙালি জাতিসত্তার আজন্মের সাক্ষী। বলছে, আমাদের মারতে পারবা না, আমরা প্রতিনিয়ত জন্মাই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের মস্তিষ্কে। আমাদের কণ্ঠ মরণেও গায় 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'।

জাতির পিতার বিছানার পাশের টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, ছোটো ডেস্ক, পড়ার টেবিল এবং টেবিলের ওপর রাখা বঙ্গমাতার সারাক্ষণের সাথী পানের বাটা। নরখাদকরা ওদের থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল পুরো পরিবারটিকে। কিন্তু না। ভালোবাসা এতাটাই গভীর যে আজ অবধি ওরা শরীরে ধারণ করে রেখেছে ছোপ ছোপ, ছিটা ছিটা রক্তের দাগ। বঙ্গমাতার ঠিকানায় প্রেরিত চিঠিটি আজও পড়ে আছে মুখবন্ধ অবস্থায়। চিঠিতে লেখা শব্দগুলো তোমার কণ্ঠে রণিত হলো না মাতা। ওই চিঠিই বলছে এক অসমাপ্ত আত্মকথা।

দোতলার দক্ষিণে বড়ো খোলা ঐতিহাসিক বারান্দা। যেখানে মিলেমিশে একাকার হতো বাংলাদেশ, বাঙালি আর বঙ্গবন্ধু। সেখানে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে হাত নাড়িয়ে তোমার অভিব্যক্তি প্রকাশ, দেওয়া দিকনির্দেশনা।

তৃতীয় তলায় কামালের কক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুলতানা কামাল খুকুর ড্রেসিং টেবিলে রাখা প্রসাধনী। কামালের সেতার, যার তার ছোঁবে না প্রিয় তর্জনী আর কীর্বোড, সাউন্ড বক্স, গানের রেকর্ড আছে তেমনই। পাশে খেলাধুলায় পাওয়া পদক, সনদ এবং শিল্ড। দক্ষিণের জানালার কাচে ওই যে গুলির চিহ্ন। সেদিন রাতে হায়েনারা সবকিছু তোলপাড় করে রেখে গিয়েছিল।

তৃতীয় তলার সর্বশেষ কক্ষে একান্তে বসে লেখাপড়া করার তোমার চেয়ার-টেবিল। যেখানে তুমি দাপ্তরিক কাজও করেছ। টেবিলের ওপরে থাকা ওই দুটি টেলিফোন শব্দহীন বঙ্গবন্ধুর মতোই সেদিন থেকে ওরাও নিস্তব্ধ।

এই বাড়িতে তোমার ব্যবহৃত চশমা, মুজিব কোট (ওয়েস্ট কোট), এরিনমোর তামাক পাইপ, কলমের সামনে নতমুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি শপথ নেয় তোমার সোনার বাংলা গড়ার। বেরিয়ে আসার পথে সে জানে, তাকে আবার ফিরতে হবে এই বাড়িতে। এই বাড়ি যে বাঙালির প্রেরণার উৎস! বাঙালির তীর্থ।

লেখক: গবেষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

বঙ্গবন্ধু হত্যা নিরূপণে তদন্ত

জাফর ওয়াজেদ

ছিলেন তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। হিমালয়ের চেয়ে উঁচু যার ব্যক্তিত্ব ও সাহস। পরাক্রম, পরাভব না মানা সময়কে সঙ্গে নিয়ে অনিরুদ্ধ অতিক্রম করেছেন। আর সেই বরাভয় কাঁধে নিয়ে এগিয়েছেন মানবমুক্তির অমোঘ মন্ত্রসহকারে। সব প্রতিবন্ধকতা, সব বাধা, সব দুঃসহ যাতনা দূরীভূত করার সংগ্রামকে করেছেন ত্বরান্বিত। হতশ্রী, পশ্চাৎপদ অসহায়, শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত নিজ জাতিকে করে তুলেছিলেন বীর যোদ্ধা। লড়াই-সংগ্রাম আর রক্ত এবং আত্মদানে যে জাতি পেয়েছে নিজস্ব মানচিত্র, দেশমাতৃকা। কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন সোনার বাংলার গান। লাল-সবুজে মেশা পতাকা দিয়েছেন, যা পতপত করে আজও উড্ডীয়মান। জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে। স্বাধীনতা ও মুক্তি শব্দ দুটি ছিল তাঁর অতিপ্রিয়। জলদগম্ভীর স্বরে জাতির আত্মবিকাশ, আত্মস্বাধীনতা আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়কালে উচ্চারণ করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দেবেন–এই অভিপ্রায় থেকেই সংগঠন শক্তিশালী করতে কাজ করেছেন। কখনো সাইকেলে, কখনো হেঁটে, আবার কখনো বা নৌকায় চড়ে গ্রামে-গঞ্জে গিয়েছেন, নেতাকর্মীদের খোঁজখবর নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে। শক্তিশালী সংগঠন ছিল বলেই দলকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন একাত্তর সালে। এমনকি স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এরও আগে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করেছেন সুকঠিনভাবে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল শান্তির পরিবেশ তৈরির। আর এই সময়টাতে সবকিছু সুনসান হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলো ধরা দিতে থাকে ক্রমশ। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল দৃঢ়। তাই মনুষ্যবিবর্জিত কোনো কর্মকাণ্ড বাঙালি করবে, এ ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাবনার জগতে অস্পৃশ্য। অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুরা তখনও 'শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' করে অস্ত্র শানিয়ে যাচ্ছিল ষড়যন্ত্রের নানা গুটি পাকিয়ে। দেশজুড়ে নানারকম অস্থিরতা,

অরাজকতার যে ডালপালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তা নিরসনে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপগুলো ততদিনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। কারণ, স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলার। অথচ স্বাধীন দেশে পরাজিত শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারীরা শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে দেয়নি তাঁকে। প্রশ্ন জাগে এখনো–স্বাধীন দেশের মাটিতে জাতির পিতাকে কারা হত্যা করল এবং কী কারণে? এর প্রকৃত ভাষ্য মেলে না। কিন্তু জাতির কাছে গত ৪৭ বছরে ক্রমশ তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধু ঘাতকের নিঃশ্বাস কি অনুভব করতে পেরেছিলেন? 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস', যিনি নিজেই জনসভায় আবৃত্তি করতেন, তিনি কি টের পাওয়ার সময়টুকু পেয়েছিলেন যে–ঘাতকরা যে কোনো সময়, যে কোনো মুহূর্তেই আঘাত হানবে। বিশ্বাস তো ছিল তাঁর প্রখর–কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা দূরে থাক, আঘাত করার মতো মানসিকতা রাখে না। ভেবেছিলেন–'সাড়ে সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি'র বিপরীতে তাঁর বাঙালি মানুষে পরিণত হয়েছে বলে স্বাধীন দেশে ফিরেই এই উচ্চারণ করেছিলেন। গুলি তাঁর বুকেই লেগেছিল, পিঠে নয়। ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল বুক। রক্তাক্ত লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। পালিয়ে যাওয়ার নন তিনি। তাই রাজনৈতিক সংগ্রামকালে বা একাত্তরের ২৫ মার্চ তিনি যেমন পালিয়ে যাননি, তেমনই ১৫ আগস্ট ভোরেও পালাননি। যদিও সেনাপ্রধান ফোনে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ রেখেছিল। কিন্তু তিনি নিজেই জীবন দিয়ে সবকিছু মোকাবিলা করেছেন। গ্রিক ট্র্যাজেডির চেয়েও বিয়োগান্ত ছিল পনেরোই আগস্টের নির্মম ঘটনাবলি। এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিবর্তনের জন্য কোনোভাবেই নয়। যার সাফাই গেয়েছিল স্বঘোষিত রাষ্ট্রপ্রধান মোশতাক, তার অবৈধ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে। এই হত্যাযজ্ঞ ছিল হিংসাত্মক প্রতিহিংসাপরায়ণতা। যার নেপথ্যে ছিল বিশাল ষড়যন্ত্র। এটা স্পষ্ট, এই ষড়যন্ত্র ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে। যদি সরকার পরিবর্তনের জন্য হতো, তাহলে ১০ বছর বয়সি শিশু রাসেলসহ আরও শিশুদের হত্যার প্রয়োজন হয় না। এটা সন্দেহাতীত যে, এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে ছিল। এবং তা প্রমাণিত হয় ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যার ঘটনায়ও। প্রতিহিংসামূলক হিংসাত্মক হত্যার প্রমাণ, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার আগে-পরে তাঁর গোটা পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে নির্মমভাবে হত্যা করার মাধ্যমে। এই হত্যাকাণ্ড যে সংবিধানের চার মূলনীতির বিরুদ্ধে ছিল, এর প্রমাণ–বাংলাদেশ বেতারকে রেডিও বাংলাদেশ এবং জয় বাংলাকে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ করার মাধ্যমে। খুনি ডালিমের কণ্ঠে ১৫ আগস্ট সকালে বেতার থেকে উচ্চারিতও হয়েছিল 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' শব্দ। এবং এসবের প্রস্তুতি হঠাৎ করে নয়, পূর্ব থেকেই ছিল।

সাতচল্লিশ বছর আগে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মরণাঘাত করা হয়েছিল। বাঙালির স্থলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নামে এক কিম্ভূত জাতীয়তাবাদ প্রচলন করে তারা। সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা করা হয়, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটানো হয়েছিল, আর গণতন্ত্র তো সামরিকতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছিল। সংবিধানের চার মূলনীতির অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল। জামায়াতসহ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলের যারা যুদ্ধাপরাধী, তারা স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই পালিয়েছিল। তাদের প্রধান গোলাম আযম তিয়াত্তর সালে লন্ডনে বসে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার প্রকল্প' নিয়ে মাঠে নেমেছিল। প্রচুর অর্থকড়ি সংগ্রহ করে দেশে পাঠিয়ে অরাজক অবস্থা তৈরি করে চলছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাকে দেশে ফিরিয়ে আনে সামরিক জান্তা শাসক জিয়া। কিন্তু গণরোষের মুখে তখন নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারেনি। সেই তাদের সহযোগিতায় দেশকে পাকিস্তান ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। যারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা এবং পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতা করেছে, তাদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন শুধু নয়–সরকারের মন্ত্রীও করা হয়। যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি দালালদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনকাল শুরু হয়, যা একুশ শতকেও এই জান্তার উত্তরসূরিরা করেছে।

মহাবিপর্যয় ঘটানো হয়েছিল ১৫ আগস্ট। দিনটি ছিল শুক্রবার। মুসলমানদের পবিত্র এই দিনে ঘাতকচক্র নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞ ছিল পরিকল্পিত, নির্ধারিত এবং সুদূরপ্রসারী। আর এই হত্যাযজ্ঞের আয়োজক মাত্র কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা সদস্য, তা নয়। এর সঙ্গে অনেক গভীর পরিকল্পনা যে ছিল, তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজিত পক্ষের মদত যেমন রয়েছে, তেমনই আন্তর্জাতিক ও পার্শ্ববর্তী ইঙ্গিত ও সাহায্য বা পরামর্শ থাকা যে সম্ভব, তা প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ছিল আমলা, বণিক, ধর্ম ব্যবসায়ী, বিভীষণ যেমন ছিল, তেমনই ছিল সেনারা। এসব ভ্রষ্ট, নষ্ট আর বিকৃতজনরাই দেশ ও জাতির মহাসর্বনাশ সাধন করেছিল। ৪৭ বছর পরও জাতি তার মাশুল দিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে দেখা গেছে, দেশজুড়ে অস্থির অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। সশস্ত্র রাজনৈতিক দলগুলো গুপ্তহত্যা, গুদাম-ফাঁড়ি লুট, পুলিশ, জনপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্যে হত্যা, খাদ্যবাহী বাহন ধ্বংস করছিল গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টিসহ চীনাপন্থি দল। এসব গ্রুপ এবং স্বাধীনতাবিরোধীরা অস্ত্রসহ চক্রান্তকারীদের সঙ্গে মিশে যায়। চারদিকে একটা বিদ্বেষ, কলুষ প্রচার-প্রোপাগান্ডা, মিথ্যাচার, গুজব ছাড়িয়ে অরাজকতার মাত্রা বাড়ানো হয়েছিল। দেশে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেও যখন কোনোভাবেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না, তখনই চরম আঘাত হানার পথ বেছে নেয়। দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে নানামুখী ও নানা মতলববাদী যার যার অবস্থান থেকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে সুবিধা নেওয়ার পাঁয়তারা করে আসছিল। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আবদুল হক ১৯৭৪ সালে ঢাকায় ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক শুধু নয়, শেখ মুজিব সরকার উৎখাতের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য চেয়ে পরে ভুট্টোকে চিঠি লিখেছিল; যা ভুট্টোর জীবনীকার তার গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। ভুট্টোর ঢাকা অবস্থানকালে চীনাপন্থি দল ও গ্রুপগুলোর সঙ্গে তার সহযোগীদের বৈঠক হয়। এসব বৈঠকে সরকার উৎখাতের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। সামরিক বাহিনীর বিপথগামী সদস্যরা হত্যাযজ্ঞে জড়িত ছিল, যা বিচারে প্রমাণিত এবং রায়েও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে কয়েকজনের। অনেকে এখনো পলাতক। এই ঘাতকচক্রের পরিকল্পনা ছিল সূদরপ্রসারী। বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দিয়ে দেশে পাকিস্তানি ভাবধারা সৃষ্টিতে পঁচাত্তরের পরে তারা সক্ষম হয়েছিল। ঘাতকচক্র অন্তত এতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নিকটজন বেঁচে থাকলে তাদের 'অসৎ উদ্দেশ্য' সফল হবে না। তাই ঘাতকচক্র এগিয়েছে অত্যন্ত নিপুণ ও নিখুঁত ছকে। তারা লক্ষ করেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ ধ্বংসস্তূপ থেকে উন্নয়নের পথে এগোতে শুরু করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন দেশটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। হাজারো বাধাবিঘ্ন মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটি স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে দ্রুতলয়ে। এখানেই স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে। দেশটির উন্নয়ন অগ্রগতি যে করেই হোক স্তব্ধ করে দিতে 'জঘন্য কৌশল' অবলম্বন করে ঘাতককুল। এই ধারণা প্রশ্নাতীত যে, দেশি ও বিদেশি শক্তিগুলো একত্রে কাজ করেই নির্মমতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আওয়ামী লীগের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে; কিন্তু হত্যাকাণ্ডের যারা পরিকল্পনা করেছে, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিচারের সম্মুখীন করা যায়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যায় যারা পরিকল্পনা করেছিল, যারা তৎপরতা চালিয়েছিল, তাদের অনেকের বিষয়ই গত সাতচল্লিশ বছর ধরে আলোচিত হয়েছে

একাংশ যেমন, তেমনই আরও রাজনৈতিক দল হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্র তৈরি ও ষড়যন্ত্রে জড়িত কিংবা সহায়ক ছিল।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে; কিন্তু হত্যাকাণ্ডের যারা পরিকল্পনা করেছে, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিচারের সম্মুখীন করা যায়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যায় যারা পরিকল্পনা করেছিল, যারা তৎপরতা চালিয়েছিল, তাদের অনেকের বিষয়ই গত সাতচল্লিশ বছর ধরে আলোচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনাকারীদের কর্মজীবন, রাজনৈতিক উত্থান, আদর্শ চিন্তা এবং তৎপরতা অনুসন্ধান করা গেলে বেরিয়ে আসবে অনেক দিগন্ত। অনেক গবেষকের কাছেই রয়েছে তথ্য-উপাত্ত। সিদ্ধান্তে আসার কাজটি সম্পন্ন হলে তাদের বিচারের আওতায় আনা যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যা নিরূপণে তদন্ত কমিশন গঠনের বিষয়টিও আলোচনায় রয়েছে অনেকদিন ধরেই। এমনকি হত্যাকাণ্ডের ওপর শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও রয়েছে। এমনটাও বলা হচ্ছে–বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকাণ্ডে বিচারিক আদালতে বিচারের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কমিশন হয়েছে, যাতে পুরো ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়। এই কমিশন গঠন করা হয় হত্যাকাণ্ডের পুরো ষড়যন্ত্র যাতে জাতি জানতে পারে। আর রাষ্ট্র যাতে এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভবিষ্যতে যেন পতিত না হয়। আমরা দেখেছি জন এফ কেনেডি, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সাতচল্লিশ বছর পর হলেও তদন্ত করা কঠিন নয়। অনেক অনুষঙ্গ, দলিলদস্তাবেজ, সাক্ষী এখনো রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের 'দেশপ্রেমিক' ঘোষণাকারী খন্দকার মোশতাক ছিলেন এই ঘটনার মূল হোতা এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী। এই সুবিধার ভাগ তিনি জেনারেল জিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে করেছেন। এই দুই সুবিধাভোগীই ছিল পরিকল্পনার প্রধান। দুজনের অবস্থান ভিন্ন হলেও এই একটি লক্ষ্যে তারা একাত্ম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন এদের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা উন্মোচন করা হলে হত্যা পরিকল্পনার একটি সরলচিত্রও উন্মোচিত হতে পারে। মোশতাক-জিয়া দুজনেই যুদ্ধকালে বিরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গড়ার উদ্যোগী হয়েছিল। তার এই ভূমিকার কারণে সরকার তাকে নজরদারির মধ্যে রেখেছিল। মোশতাকের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ ছিল যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এমনকি স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকার জাতিসংঘে যে পর্যবেক্ষক দল পাঠায়, তাতে মোশতাককে প্রতিনিধিদলের তালিকা থেকে বাদ দিতে বাধ্য হয়। সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক আলোকপাত করেছেন যে, জিয়া-মোশতাকের ভূমিকা ছিল এই হত্যাকাণ্ডে। তাদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। একাত্তরের যুদ্ধ, স্বাধীনতাপরবর্তী তাদের দুজনের ভূমিকা এবং পঁচাত্তরপরবর্তী জিয়ার সব কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট যে, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি। জিয়া ছিলেন পাকিস্তানের ভাবাদর্শের একজন সৈনিক। বাল্যকাল থেকে পাকিস্তানে বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, চাকরিজীবনে জিয়া আত্মস্থ করেছিলেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ। উনসত্তরের মাঝামাঝি জিয়া এদেশে আসেন। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যটি একাত্তরে সীমান্তে পাড়ি দিলেও পাকিস্তানি সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। বরং তার স্ত্রীকে ঢাকা সেনানিবাসে বহাল তবিয়তে সযত্নে রেখেছিল। স্বামীর ডাকে সাড়া দিয়ে সীমান্তও পাড়ি দেননি। জিয়ার আসল রূপ ফুটে উঠেছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে। তাই বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়া ও মোশতাকের ভূমিকা উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করা আবশ্যিক।

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, জিয়া ক্ষমতা দখলের পরই দেশকে পাকিস্তানে পরিণত করার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের স্থান এবং পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের স্থানটি শিশু পার্কে পরিণত করেছিল স্বাধীনতার সব চিহ্ন মুছে ফেলার লক্ষ্যে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের রক্ষায় মোশতাক-জিয়া ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকা এবং বেনিফিশিয়ারি হওয়ার সুবাদে নিজেদের রক্ষার জন্য তারা এই পথ বেছে নিয়েছিল। পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট হয়, জিয়া-মোশতাক একই লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং হত্যাকাণ্ডে রাজনীতির একটা সম্পৃক্ততা ছিল। আর তা ছিল বলেই মোশতাক-জিয়াকে হত্যাকাণ্ডের পর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। তারা পাকিস্তানি ভাবাদর্শে যে লালিত, তা তাদের কর্মে পরিস্ফুটিত। যুদ্ধকালেই পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে দূতিয়ালি করেছিল মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী গংরা, তাতে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ সরকার। শেখ মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে আনা এই প্রস্তাব ভেঙে গেলেও মোশতাকের তৎপরতা স্বাধীনতার পরও থেমে থাকেনি।

এমনটা মনে আসে, পনেরোই আগস্ট ভোরে যখন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, তখন জিয়া-মোশতাক নিশ্চয় জাগ্রত ছিলেন অপেক্ষায়। যদি তাই না হবে, তবে ঘটনা সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে তারা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন কীভাবে? মোশতাক ভোরে বেতার কেন্দ্রে হাজির হয়ে ডালিমের ঘোষণার পর পরই ভাষণ দেন এবং নয়া সরকার গঠন ও ফরমান জারি করেন কীভাবে। দেখা যায়, তিন বাহিনীসহ বিডিআর প্রধানও দ্রুত আত্মসমর্পণ, হত্যাকারীদের সমর্থনসহ বেতারে ভাষণ দেন। তারা নিশ্চয় অবহিত ছিলেন, কী ঘটবে, কী ঘটতে যাচ্ছে এবং ঘটার পরের করণীয় এবং দৃশ্যপটে তাদের যথাসময়ে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি। সবই হয়েছে দ্রুত। জেনারেল জিয়া সামরিক কর্মকর্তা

হিসাবে যে শপথ নিয়েছিল–তার চাকরির শর্তানুযায়ী, দেশের সংবিধান অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রদ্রোহিতার খবর অবহিত হলে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো। সামরিক বাহিনীর উপপ্রধান অধিনায়ক হিসাবে জিয়ার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা, কিন্তু তা করেননি। বরং তাকে অবহিত করার জন্য আসা অপর সামরিক কর্মকর্তাকে তিনি রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার কথা শুনে বলেছিলেন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে, 'তাতে কী!' স্বঘোষিত খুনি ফারুক ১৯৭৬ সালে আইটিভিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জিয়ার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছিল। কতিপয় মেজর সামরিক নিয়মানুযায়ী এবং সামরিক বিধিবলেই বহিষ্কৃত হয়েছিল। তারাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল। তাদের বিরুদ্ধে জিয়া-মোশতাক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, বরং তাদের পুরস্কৃত করে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। জিয়ার সামরিক আইন ও বিধি লঙ্ঘন এবং উচ্চাভিলাষিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ঘটিয়েছিল। মোশতাকসহ হত্যার পরিকল্পনাকারীরা কুমিল্লার 'বার্ড'-এ যে গোপন সভা করত, তাতে বাঙালি অফিসারও ছিল। তারা পাকিস্তান প্রশাসন থেকে বাংলাদেশ সরকারের সিএসপি/প্রশাসনে স্থানান্তর হয়। তাদের অতীত পর্যবেক্ষণ করে। হরতাল ডাকা হয়েছিল সশস্ত্র একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছিল। একটা মানসিক চাপ তৈরি করা হয় সেদিন। সমাবর্তনে যোগদানকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও সে রাতের ঘটনা প্রমাণ করে না নিরাপত্তাব্যবস্থা সামান্যতম হলেও ছিল। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের প্রহরার দায়িত্বও পরিবর্তন করা হয়েছিল। নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল একাত্তরের পাকিস্তান বাহিনীর হয়ে যুদ্ধবিরোধী অবস্থানে থাকা পাকিস্তান প্রত্যাগত এক সেনা কর্মকর্তার অধীনস্থ ট্রুপকে। ঘটনার আগের দুসপ্তাহে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কারা দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন, কারা বঙ্গবন্ধুর তথ্য পাচার করতেন, তা অজানা রয়ে গেছে। দলের ভেতরে থাকা উপদল, গ্রুপ, উপগ্রুপগুলোর তৎপরতা-অপতৎপরতার ভেতর বঙ্গবন্ধুবিদ্বেষ মাত্রা কতটুকু ছিল, তা অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে।

কেন বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রয়োজন ছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের, তা গত ৪৭ বছরে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থান রয়ে গেছে অজ্ঞাত। তারও নেপথ্যে প্রকাশ্য নানা কারণ থাকতে পারে। সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে বা সামান্যতম হলে পালন করেছিলেন, এমনটা জানা যায় না। মোশতাক

কিন্তু এই হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থান রয়ে গেছে অজ্ঞাত। তারও নেপথ্যে প্রকাশ্য নানা কারণ থাকতে পারে। সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে বা সামান্যতম হলে পালন করেছিলেন, এমনটা জানা যায় না

করলে স্পষ্ট হয় যে, পাকিস্তানি ভাবধারায় তারা নিমজ্জিত ছিল। একজন আমলার কবর তো পাকিস্তানে। আরেকজন এখনো পলাতক। যিনি যুদ্ধকালে মাহবুবুল আলম চাষীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ছিলেন। নড়াইলের এডিসি থাকাকালে সীমান্ত পাড়ি দেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের অনেকেই একাত্তরের যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান থেকে, তাদের ভাষায় 'পালিয়ে এসে' মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর এরাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। একজন তো সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠন করে রাজনীতিকদের শুধু নয়, ৭ নভেম্বর সেনা কর্মকর্তা হত্যা করতে পিছপা হয়নি। পাকিস্তানের কাকুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই 'যোদ্ধারা' পাকিস্তানি চরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল স্বাধীনতার পর পরই। যুদ্ধকালে জিয়ার ভূমিকায় সেনাপ্রধান ওসমানী নাখোশ হয়েছিল কয়েকবার। সেই জিয়ার সঙ্গে মোশতাকের সংযোগ ঘটেছিল যুদ্ধকালেই। এসব অনুসন্ধান জরুরি। তারা সময় বেছে নিয়েছিল ১৫ আগস্ট ভোরকে। সূর্যোদয়ের পর বঙ্গবন্ধুর যাওয়ার কথা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে চ্যান্সেলর হিসাবে যোগ দিতে। এই অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করার জন্য ১৪ আগস্ট বিকালে ও রাতে ঢাকা শহরে গণবাহিনী বোমাবাজি

ক্ষমতায় বসে বঙ্গবন্ধু প্রণীত সব ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করে পাকিস্তানি বিধিবিধান ও ধারা চালু করেছিল। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দেশগুলোর সমর্থন আদায়, গলাকাটা শ্রেণিশত্রু চেতনাধারী ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের উন্মুক্ত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা করে। জিয়া তার বিস্তার ঘটায়। দালাল আইনে আটকরা ছাড়া পেতে থাকে, চিহ্নিত অপরাধীরা। যাদের দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করা, তারাই খুনিদের প্রতি, মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্যে শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটাকেও হত্যা করা হয়েছিল। ভূলুণ্ঠিত করা হয় মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সবকিছু। বঙ্গবন্ধুকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বাপর সময়। ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা সেই চেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এখনো চক্রান্ত চলছে। হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে। আর এজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক